# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০১ সামাজিক সমস্যার ধারণা

# আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক সমস্যার ধারণা
টপিক ০২: বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার
টপিক ০৩: বাংলাদেশের নিরক্ষরতা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার
টপিক ০৪: বাংলাদেশের বেকারত্বের ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার
টপিক ০৫: বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার
টপিক ০৬: বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা
টপিক ০৭: বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব
টপিক ০৮: বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব
টপিক ০৯: বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

# সামাজিক সমস্যার ধারণা

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল | |
|---|---|---|
| | ক | খ |
| | গ | ঘ |

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের আশ্রয়স্থাল হলো সমাজ। পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে সমাজে মানুষকে থাকতে হয়। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এ সম্পর্কের মাঝে আছে নানাবিধ সমস্যা ও সম্ভাবনা। সামাজিক এরূপ সমস্যা সমাজের একটি স্বাভাবিক চিত্র। সমাজে বসবাসরত মানুষের আদর্শ ও মূল্যবোধ সামাজিক আদর্শকে সুস্পষ্ট করে তোলে। কারণ, সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ পরিপন্থি কোনো পরিস্থিতি। অর্থাৎ বলা যায়, যে পরিস্থিতি সামাজিক সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করে, মূল্যবোধ পরিপন্থি আচরণ সৃষ্টির সহায়ক, তা-ই সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচিত হয়। পৃথিবীর কোনো সমাজই সমস্যামুক্ত নয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা আরও বেশি। বহুবিধ সামাজিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এরূপ সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সমস্যা। সমস্যা ছাড়া কোনো সমাজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আবার এ সমস্যাই মানব সমাজকে গতিশীল ও সচল রেখেছে। চাহিদা-যোগানের অসামঞ্জস্য এবং দ্বন্দ্বময় সামাজিক জীবনের কার্যাবলি থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এরূপ সমস্যা মানুষের সার্থক জীবনযাপনকে বাধাগ্রস্ত করে, অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি করে, সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে।

'সামাজিক সমস্যা' শব্দটি 'সামাজিক' ও 'সমস্যা' প্রত্যয় দুটি যোগে গঠিত। এখানে 'সামাজিক' প্রত্যয়টি সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে নির্দেশ করে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এসব বিষয় সরাসরি সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবনযাপন, আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, 'সমস্যা' প্রত্যয়টি দ্বারা সাধারণভাবে অবাঞ্ছিত, দ্বন্দ্বপূর্ণ, অসম, জটিল, অপ্রত্যাশিত অবস্থাকে বোঝানো হয়। তাই 'সামাজিক সমস্যা' সম্পর্কে বলা যায়, এটি হলো মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ কাঠামো, সমাজের বিদ্যমান রীতিনীতি ও আদর্শের পরিপন্থী অবস্থা। সমাজের সাথে এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত এবং ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা বা আচরণ, যা সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, তাই হলো সামাজিক সমস্যা।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



সামাজিক সমস্যার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন। কেননা সমাজে নানা ধরনের সমস্যা অর্থাৎ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি বা অবস্থা লক্ষ করা যায়। আবার উৎপত্তি, ধরন, ব্যাপকতা, প্রবণতা, সমস্যা সৃষ্টির কারণ, সমস্যার সাথে অন্যান্য বিষয় প্রভৃতি সকল দিক থেকেই এক সমস্যা হতে অন্য সমস্যার প্রকৃতিগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে জনগণের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, আবহাওয়া, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলোকে প্রধান হিসেবে ধরা হয়; কিন্তু মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে এ সমস্ত কারণ বা বিষয়ের পরিবর্তে হতাশা, কৌতূহল, পারিবারিক ভাঙন, মাদকের সহজলভ্যতা, অসৎ সঙ্গ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বেকারত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচিত। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত 'কিশোর অপরাধ'কে শহর এলাকার সামাজিক সমস্যা হিসেবে ধরা হয়। গ্রাম এলাকায় যে কিশোর অপরাধ নেই তা নয়; তবে সমস্যাটির ব্যাপকতার মাত্রা গ্রামের তুলনায় শহরেই বেশি।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



সামাজিক সমস্যা তাই প্রকৃতিগত দিক বিচারে বেশ বিচিত্র। তবে তাই বলে সামাজিক সমস্যাকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা যে থেমে আছে তা নয়; বরং সামাজিক সমস্যার কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদানের বহুমুখী প্রচেষ্টা সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে লক্ষ করা যায়। সমাজবিজ্ঞানী L. A. Frank 'American Journal of Sociology'-তে প্রকাশিত তাঁর 'Social Problem' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "Social problem is any difficulty or misbehavior of fairly large number of persons which we wish to remove or correct." অর্থাৎ, সামাজিক সমস্যা হলো কোনো অসুবিধাজনক অবস্থা যা সমাজস্থ অনেক মানুষের অবাঞ্ছিত আচরণ, যা আমরা সংশোধন বা দূর করতে চাই।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, সমাজের এ অসুবিধাজনক অবস্থা বা মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সমাজের বৃহদাংশের ওপর এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সমাজের মানুষ সাধারণত সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসুবিধাজনক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। কেননা সমাজের মানুষ মনে করে যে, এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তথা সামাজিক সমস্যাই তাদের সমস্ত অসুবিধা ও অমঙ্গলের জন্য দায়ী। Arnold Rose তাই সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A Social problem may be defined as a situation which has influenced a good majority of people, i. e., they believe that this situation itself is responsible for their difficulties or displeasures which may be reformed." অর্থাৎ, সামাজিক সমস্যা এমন একটি অবস্থা যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যাদের ওপর সামাজিক সমস্যা প্রভাব বিস্তার করে তারা তাদের কঠিন অথবা অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য একে দায়ী করে এবং এ থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়।

Rabb and Selnik আবার সামাজিক সমস্যাকে সামাজিক সম্পর্কের সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, "It is the problem of social relationship which challenges the society itself or creates obstacles in the satisfaction of important ambitions of many people." অর্থাৎ, সামাজিক সম্পর্কজনিত সমস্যা যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের সন্তোষজনক প্রত্যাশা পূরণে বাধার সৃষ্টি করে।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে 'International Encyclopaedia of the Social Sciences' Vol-14 এ বলা হয়, "Social problems are described most simple as perplexing questions about human societies proposed for solution. Social problems are part of the climate of opinion in Society which enters on expressed needs for public policies and anticipated requirements for social control." সামাজিক সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার লক্ষ্যে Mckee M. Rebertson তাঁর 'Social Problem' গ্রন্থে বলেন, "A Social problem exists when a significant people, percive an undesirable difference between social ideals and social realities and before that this difference can be eliminated by collective action." অর্থাৎ, সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অথবা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোক যখন সামাজিক আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে অবাঞ্ছিত বৈপরীত্য বা পার্থক্য লক্ষ করে এবং যদি তারা বিশ্বাস করে যে, ঐ পার্থক্যগুলো যৌথ প্রয়াসের দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব তখন বুঝতে হবে যেকোনো সমাজে একটি সামাজিক সমস্যা বিরাজ করছে।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজদেহ হতেই উদ্ভূত এবং সমাজের মাঝেই এটি বিস্তৃত হয়ে আবার সমাজেরই অনিষ্ট সাধন করে। সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সামাজিক উপাদানসমূহের সাথে সমাজস্থ মানুষের এবং উপাদানসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া হতেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। আবার সমাজ মাত্রই এর সদস্যগণ কতিপয় আদর্শ ও মূল্যবোধের অনুসারী হয়ে থাকেন। এ সমস্ত আদর্শ ও মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজস্থ মানুষেরা যেমন তাদের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করে তেমনি এগুলোর কার্যকর অনুশীলনই আবার সমাজকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। কিন্তু সামাজিক সমস্যা এমনই এক অবস্থা যা সমাজের এ সকল আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য হুমকিস্বরূপ বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় অথবা এগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আর সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা ধ্বংস সমাজের মানুষকে অর্থনৈতিক ও আবেগীয় দুর্দশায় নিপতিত করে। Robert L. Barker (editor) তাঁর 'The Social Work Dictionary' তে বলেছেন, সামাজিক সমস্যা হলো- "Conditions among people leading to social responses that violated some people values and norms and cause emotional or economic suffering." অর্থাৎ, সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষদের সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থী কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



Eurl Rabington and Martin S. Weinberg সামাজিক সমস্যার নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তাদের 'The Study of Social Problems' নামক গ্রন্থে, "A social problem to be an alleged situation that is in compatible with values of a significant number of people who agreed that action is needed to after the situation." অর্থাৎ, সামাজিক সমস্যা একটি অনভিপ্রেত অবস্থা যা অধিকাংশ মানুষের ওপর মূল্যবোধগত সংশয় প্রদর্শন করে এ ধরনের পরিস্থিতি দূর করার জন্য কার্যক্রম প্রয়োজন হয়।

এ ব্যাখ্যাটি বিশ্লেষণ করলে চারটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়-

১. অনভিপ্রেত অবস্থা (Alleged Situation),

২. মূল্যবোধগত সংশয় (Compatible with values),

৩. অধিকাংশ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে (Significant number of people) ও

৪. সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ প্রয়োজন (Action is needed) 1

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



## সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সমস্যার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিই হয় মূলত সমাজজীবনে।
২. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য।
৩. সামাজিক সমস্যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।
৪. সামাজিক সমস্যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে।
৫. সামাজিক সমস্যা সমাজের মূল্যবোধ পরিপন্থি একটি পরিস্থিতি।
৬. পরিবর্তনশীল সমাজে সামাজিক সমস্যাও পরিবর্তনশীল।
৭. সামাজিক সমস্যা একাধিক কারণে সৃষ্ট এবং সমাধানযোগ্য।
৮. অধিকাংশ জনগণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিকূল পরিস্থিতি।
৯. সামাজিক সমস্যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক উন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টিকারী।
১০. পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসচেতনতা এবং সমাধানে সমবেত প্রচেষ্টা অনুভূত হওয়া।

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



## সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাই বলা যায়, উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেসকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সেগুলোই সামাজিক সমস্যা।

নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বের এ বাংলাদেশ। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, মাদকাসক্ত, নারী নিরাপত্তা, যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, কর্মজীবী নারীর সমস্যা, বার্ধক্য সমস্যা, প্রবীণ সমস্যা, জঙ্গিবাদ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ প্রভৃতি। সমাজজীবনে মানুষ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিচে একটি ছকচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।'

# সামাজিক সমস্যার ধারণা



## সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সমস্যা

| আর্থসামাজিক সমস্যা | মানসিক সমস্যা | রাজনৈতিক সমস্যা | পরিবেশগত সমস্যা |
|---|---|---|---|
| ☐ জনসংখ্যা সমস্যা | ☐ প্যারানইয়া | ☐ দুর্নীতি | ☐ খরা |
| ☐ দারিদ্র্য | ☐ হিস্টিরিয়া | ☐ সন্ত্রাস | ☐ বৃষ্টি |
| ☐ অপরাধ | ☐ ম্যানিয়া | ☐ জঙ্গিবাদ | ☐ অতিবৃষ্টি |
| ☐ নিরক্ষরতা | ☐ অটিজম | ☐ হরতাল প্রভৃতি | ☐ অনাবৃষ্টি |
| ☐ বস্তি | ☐ প্রতিবন্ধিতা | | ☐ শিলাবৃষ্টি |
| ☐ অন্ধত্ব | ☐ মানসিক অসুস্থতা | | ☐ বন্যা |
| ☐ বেকারত্ব | ☐ আত্মহত্যা প্রভৃতি | | ☐ জলোচ্ছ্বাস |
| ☐ অপুষ্টি | | | ☐ টর্নেডো |
| ☐ অপরাধ | | | ☐ বায়ু দূষণ |
| ☐ কিশোর অপরাধ | | | ☐ পানি দূষণ |
| ☐ যৌতুক | | | ☐ শব্দ দূষণ প্রভৃতি |
| ☐ বাল্যবিবাহ | | | |
| ☐ নারী ও শিশু নির্যাতন | | | |
| ☐ প্রবীণ সমস্যা | | | |
| ☐ পতিতাবৃত্তি | | | |
| ☐ ভিক্ষুক সমস্যা প্রভৃতি | | | |

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

# বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

## This Topic is important for

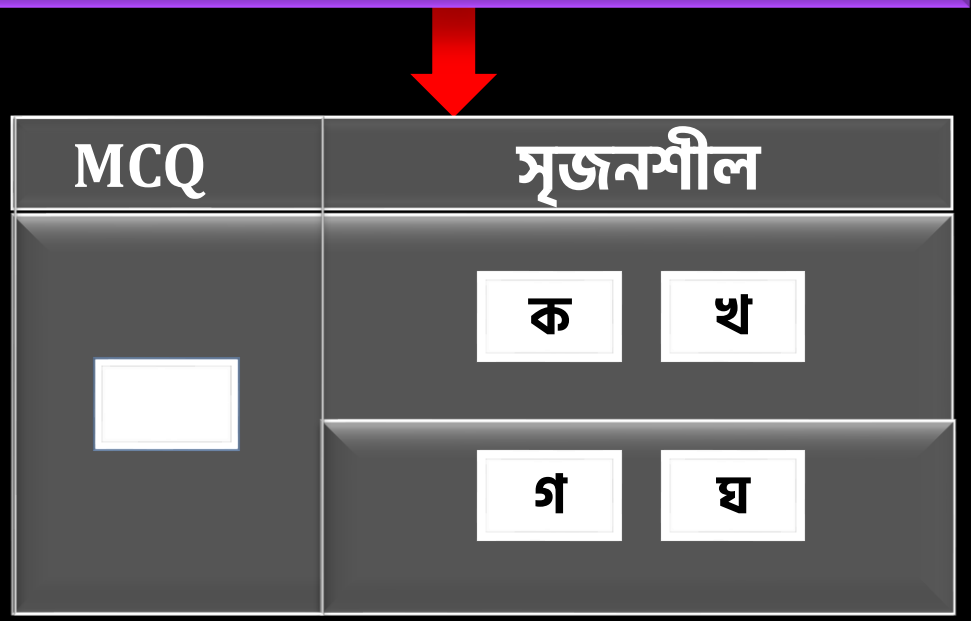

## বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

জনসংখ্যা একটি দেশের সম্পদ বা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি রাষ্ট্রের ৪টি মৌলিক উপাদানের একটি। ভারসাম্যপূর্ণ কাম্য জনসংখ্যা ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। দেশের সার্বিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যা আবশ্যক একটি উপাদান। সঠিক বা কাম্য জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ জনসংখ্যা যদি কাঙ্ক্ষিত সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়, তবে তা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশে প্রাপ্য সম্পদ ও আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা জনাধিক্যের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যা সমস্যা একটি বড় সমস্যা।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনের এদেশের বর্তমানে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন (আদমশুমারি রিপোর্ট ২০২২) এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,১১৯ জন, যা ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি-বর্গকিলোমিটারে ১,০১৫ জন। বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ভিন্ন। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এ ৩০ বছরে এদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। যে কারণে ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে ১ নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে।

## বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

বাংলাদেশে ১৬৫০ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি। কিন্তু ২০১৪ সালে এসে তা হয়েছে ১৫.৫৮ কোটি। অর্থাৎ ৩৬৩ বছরে এদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে পনেরো গুণ। যেখানে ১৬৫০ থেকে পরবর্তী ২০০ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে দুই গুণ হয়েছিল, সেখানে গত ৪০ বছরেই তা দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৭৪ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের সাফল্যও উল্লেখ করার মতো। কেননা ১৯৭৩ সালে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩%, সেখানে ২০১৪ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১.৩৭% ভাগে (সূত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৪)।

২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ সাময়িক প্রাক্কলন অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লাখ। 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার – ১.৩৭%। পুরুষ মহিলা অনুপাত ১০০.৩: ১০০। জনসংখ্যার ঘনত্ব – ১,০৭৭ জন/বর্গ কি.মি.। প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭০.৯ বছর, পুরুষ ৬৯.৪, মহিলা ৭২.৩ বছর।

## বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যার কারণসমূহ

জনসংখ্যাধিক্য বাংলাদেশের একটি জটিল সমস্যা। দীর্ঘদিনের সৃষ্ট এ আর্থসামাজিক সমস্যাটি বিভিন্ন কারণে এরূপ অবস্থায় এসে পৌছেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার জন্য দায়ী কারণগুলোকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. প্রাকৃতিক কারণ, ২. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ এবং ৩. অর্থনৈতিক কারণ। এ কারণগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-

প্রাকৃতিক কারণ

১. ভৌগোলিক অবস্থান: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রাচীনতম কারণ। মৌসুমি জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, উর্বর মাটিতে এখানে জীবনযাত্রা অনেক সহজ। তাই এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই।

২. উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা: ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন প্রণালি ইত্যাদি কারণে এদেশের নারীদের উর্বরতা অনেক বেশি। ২০১১ সালে আদমশুমারির রিপোর্ট অনুসারে নারীদের উর্বরতা ২ শতাংশের বেশি। এ কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৩. উচ্চ জন্মহার এবং নিম্ন মৃত্যুহার: বাংলাদেশে শিশু জন্মহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে মৃত্যুহার কমে গেছে। জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যকার এরূপ পার্থক্যের দরুন সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

## বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যার কারণসমূহ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

১. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ: বাংলাদেশের সমাজে বাল্যবিবাহ একটি স্বাভাবিক চিত্র। UNFPA-এর ২০০৪ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৫-১৯ বছরের কিশোরীদের মধ্যে প্রতি হাজারে ২১১.৭ জন সন্তানের মা। এছাড়া বাল্যবিবাহের দরুন দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে অধিক সন্তান জন্ম নেওয়ার প্রবণতা থাকে। আধুনিককালে বাল্যবিবাহ কমে আসলেও বহুবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ।

২. যৌথ পরিবার: যৌথ পারিবারিক কাঠামোতে সন্তান লালন-পালন সহজ। দাদা-দাদি অধিক নাতি-নাতনি পালনে উৎসাহবোধ করেন। তাই এরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরোক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা: বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। এরূপ নিরক্ষর জনগণ জীবন সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই কুসংস্কার ও উদাসীনতার ফলে এসব পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে চলছে।

৪. দারিদ্র্য ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান এদেশের জনসংখ্যার বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে থাকে। এদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এসব পরিবারে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। সচেতনতাও কম। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এদের অংশগ্রহণ নেই। ফলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে।

## বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যার কারণসমূহ

৫. নারী শিক্ষার নিম্নহার ও নারীর ক্ষমতায়নের অভাব: নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ কম। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নারীর ভূমিকা নগণ্য। শিক্ষার আলো বঞ্চিত নারীরা স্বাস্থ্য ও শিশু লালন-পালনের স্বাস্থ্যসম্মত উপায় সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে। ফলে অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে তাদের অনীহা নেই। এটিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

৬. খাদ্যাভ্যাস: আমিষ জাতীয় খাবার মানুষের প্রজনন ক্ষমতাকে হ্রাস করে। কিন্তু অধিক মাত্রায় শর্করা প্রজনন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে। আমাদের দেশের মানুষের খাদ্যে আমিষের তুলনায় শর্করার পরিমাণ অনেক বেশি। তাই প্রজনন ক্ষমতাও বেশি।

৭. চিত্তবিনোদনের অভাব দরিদ্র জনসাধারণের নাগালে চিত্তবিনোদনের অন্যান্য উপকরণ না থাকায় যৌনক্রিয়াই প্রধান বিনোদনের মাধ্যমে পরিণত হয়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

## বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যার কারণসমূহ

অর্থনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কারণও দায়ী। এদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি। সনাতনী কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় কৃষিকাজে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। যে কারণে কৃষিভিত্তিক সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি দেখা যায়। আবার কৃষিনির্ভর সমাজে মহিলাদের কর্মসংস্থানেরও পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। কিন্তু মহিলাদের কর্মসংস্থানের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিদ্যমান। কর্মজীবী মহিলারা সাধারণত অধিক সন্তান নিতে চান না। কিন্তু মহিলাদের কর্মসংস্থান কম বলে অধিক সন্তান জন্মদানে তাদের সমস্যা হয় না। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন। সন্তান লালন-পালন উচ্চ জীবনযাত্রার মানে যতটা ব্যয়বহুল, নিম্ন সমাজে ততটা নয়। তাই এরূপ অর্থনৈতিক কাঠামোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ার ফলে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবও দেখা যায়। যে কারণে অধিক সন্তানকে তারা ভবিষ্যৎ আশ্রয়স্থল বলে মনে করে। এজন্য তারা অধিক সন্তান জন্মদানে উৎসাহী হয়।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

১. মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা: মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাসমূহ (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) পূরণ করা আবশ্যক। কিন্তু এ চাহিদাসমূহ পূরণের পথে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে উচ্চ জনসংখ্যা। উচ্চ জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ ন্যূনতম খাদ্য গ্রহণ (২১২২ কিলোক্যালরি), আবশ্যিক বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, পয়ঃসুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারছে না।

২. পারিবারিক ভাঙন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি: অধিক জনসংখ্যার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণে অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, যা থেকে জন্ম নেয় হতাশা, ব্যর্থতা ও অসন্তোষ। ফল হিসেবে পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

৩. সামাজিক বিশৃঙ্খলা: জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে যেমন পারিবারিক বিশৃঙ্খলা আনে, তেমনি এ থেকে সৃষ্টি হয় সমাজ জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা, অশান্তি, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি ও নৈরাজ্য।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

৪. অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা অধিক জনসংখ্যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আবাদি জমির ওপর একদিকে যেমন বসতি, শিল্পকারখানা গড়ে তোলার চাপ পড়ে, তেমনি উৎপাদন বাড়ানোরও দরকার হয়। এতে শিল্প ও কৃষি উভয়ই ব্যাহত হয়। আবার ভোগ্যব্যয় বেড়ে যাওয়ার ফলে মূলধন গঠন হয় না। তাই বিনিয়োগ হয় না। সার্বিক বিচারে অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ পড়ে।

৫. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট: অধিক জনসংখ্যা ইকোসিস্টেমকে নষ্ট করে দেয়। দেশের পরিবেশ প্রতিবেশ বিপন্ন হয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বারবার আঘাত করে থাকে। এরূপ অবস্থা জনস্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে।

৬. অপরাধমূলক কর্মকান্ডের প্রসার: অধিক জনসংখ্যার যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবহেতু বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। অধিক জনসংখ্যার জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। চুরি, ছিনতাই, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ বেড়ে যায়।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

৭. শিক্ষার সমস্যা: দেশের জনগণ যত বাড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তত বাড়ানো প্রয়োজন হয়। আবার বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য দিয়ে প্রয়োজনী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করাও কষ্টকর। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। যে কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় না। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার জন্যও অনেকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

৮. খাদ্য ঘাটতি: বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থানের চাপ কৃষি জমির ওপরই পড়ছে। তাই কমে যাচ্ছে কৃষি জমি। ফলে ব্যাহত হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন। বাংলাদেশে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ মাত্র ০.২৫ একর, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

৯. গৃহ ও বস্তি সমস্যা: উচ্চ জনসংখ্যাই বাংলাদেশের গৃহ ও বস্তি সমস্যার প্রধান কারণ। প্রতিবছর বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য ৪ লাখ অতিরিক্ত বাড়ির প্রয়োজন, যেখানে এত পরিমাণ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। যে কারণে জনসংখ্যার একটি বৃহত্তর অংশ খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায় বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করে। ঢাকা শহরের ৩৫% ভাগ জনগণ বস্তিতে বাস করে।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

১০. বস্ত্র ঘাটতি: জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার বস্ত্র ঘাটতি তৈরি করে। বিবিএস-এর মতে, মাথাপিছু বার্ষিক বস্ত্রের প্রয়োজন ১০ মিটার হলেও বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য তা যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। যে কারণে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বস্ত্র আমদানি করতে হয়।

১১. ভূমির ওপর অতিরিক্ত চাপ: অতিরিক্ত জনসংখ্যা সরাসরি ভূমির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০৩৫ জন বাস করে। জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। ফলে ভূমির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এটি পরিবেশেরও ক্ষতি করছে।

১২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমস্যা জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে সরকারি হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ১,৮৬০ জন, রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা ২,৮৬০ জন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী ৬৬.৬% ভাগ। এটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার দুর্বলতার এক করুণ চিত্র নির্দেশ করে। যার জন্য উচ্চ জনসংখ্যা অন্যতম কারণ।

১৩. উন্নয়নের অন্তরায়: উচ্চ জনসংখ্যা দেশের সব ধরনের উন্নয়নকে ব্যাহত করে। অধিক জনসংখ্যার ভোগ্যব্যয়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতেই অধিকাংশ ব্যয় হয়। তাই সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। শিল্পায়ন ব্যাহত হয়, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে পড়ে।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

বহুবিধ কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি এর নেতিবাচক প্রভাবও বহুমুখী। তেমনি এ সমস্যা সমাধানের জন্যও প্রয়োজন বহুমুখী সমন্বিত পদক্ষেপ। এর প্রধান কয়েকটি আলোচনা করা হলো-

১. শিক্ষা বিস্তার: শিক্ষা মানুষের জীবনমানকে উন্নত করে, সচেতনতা বৃদ্ধি করে, জীবনে চলার পথে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষিত মানুষের চেয়ে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। তাই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হ্রাস পাবে। নারী শিক্ষা এক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন।

২. পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে জোরদারকরণ: পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের নিকট এটিকে সহজলভ্য করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য আইন করতে হবে।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

৩. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন: কৃষি ও শিল্পের আধুনিকায়ন করা হলে এর উৎপাদন বাড়বে। জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়বে। বর্ধিত আয় জনগণের জীবনমানকে উন্নত করবে, যা সচেতনতা বাড়াবে। আর এরূপ পরিস্থিতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

৪. কৃষিবহির্ভূত কাজের ব্যবস্থা করা: কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং শিল্প সহায়ক আর্থিক সাহায্য দিয়ে কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ করতে হবে। সেই সাথে কৃষিবহির্ভূত আয় উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিতে সাময়িক বেকারত্ব হ্রাস করা গেলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পাবে বলে গবেষণায় দেখা যায়।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন এবং মহিলাদের কর্মসংস্থান: মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে তা তাদের ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়া মহিলাদের মাঝে যারা কর্মজীবী তাদের অধিক সন্তান নেওয়ার প্রবণতা কম। এজন্য এসব পদক্ষেপ জনসংখ্যার বৃদ্ধিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ: বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করা গেলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করতে হবে। সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে দেরিতে বিবাহকে উৎসাহিত করতে হবে।

## বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

৭. শিশু মৃত্যুহার হ্রাস: এদেশের শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যায়। পুষ্টিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পানিতে ডুবে মারা যাওয়া এর মধ্যে প্রধান। শিশু মৃত্যুর উচ্চহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। তাই শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা: জনসাধারণের জন্য নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকার ফলে জনগণ যৌন প্রক্রিয়াকেই একমাত্র চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক কারণ হিসেবে কাজ করে। শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে এ সমস্যা প্রকট। তাই শহর ও গ্রামাঞ্চল নির্বিশেষে বিকল্প চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যদি ব্যাপক আকারে নেওয়া হয়, তবে তা জনগণকে উৎসাহিত করে। বৃদ্ধকালে সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে লোকজন বেশি সংখ্যক সন্তান, বিশেষত পুত্রসন্তানের প্রত্যাশা করে। তাদের প্রত্যাশা, বৃদ্ধকালে এসব সন্তান তাদের আশ্রয়স্থল হবে। কিন্তু যদি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী থাকে তবে মানুষ এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকত। অতএব যদি বৃদ্ধ বয়সে মানুষ আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায় তবে অধিক সন্তান নিতে আগ্রহী হবে না। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

১০. বয়স্ক শিক্ষা: বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, যাদের বয়স বিদ্যালয় গমন উপযোগী নয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এদের নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের নিরক্ষরতা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

# বাংলাদেশের নিরক্ষরতা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# বাংলাদেশের নিরক্ষরতা সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার



Read, Write & Arithmatic এর অনুপস্থিতিই হলো নিরক্ষরতার মূলকথা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো বিধি লিখতে, পড়তে এবং দৈনন্দিন জীবনের হিসাব নিকাশ করতে পারেনা সেই নিরক্ষর। এককথায় অক্ষরজ্ঞানের অভাবই হলো নিরক্ষরতা।

কোনো দেশের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক উপাদান। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায়, শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরও শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে সাক্ষরতার হার ৫৭.৯% ভাগ। আবার ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে এটি ৫১.৮% ভাগ এবং মানব উন্নয়নের বৈশ্বিক প্রতিবেদন (UNDP-2013) অনুসারে এটি ৫৬.৮% ভাগ। বাংলাদেশের শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হারে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতার বিগত কয়েকটি আদমশুমারির প্রতিবেদন দেওয়া হলো-

১৯৬১ সালের আদমশুমারি ১৯৬১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সাক্ষরতার হার ছিল ১৭.৬% ভাগ। অর্থাৎ নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল ৮২.৪% ভাগ। গ্রামীণ এলাকায় নিরক্ষর ছিল ৮৯% ভাগ। পুরুষ ও মহিলা সাক্ষরতার হার ছিল যথাক্রমে ২৬% এবং ৮.৬% ভাগ মাত্র।

১৯৭৪ সালের আদমশুমারি: এ প্রতিবেদন অনুসারে সাক্ষরতার হার ছিল ২০.২ ভাগ। পুরুষ ও মহিলার হার ছিল যথাক্রমে ২৭.৬% এবং ১২.২% ভাগ।

১৯৮১ সালের আদমশুমারি: এ রিপোর্ট অনুসারে সাক্ষরতার হার ছিল ১৯.৭% ভাগ। পুরুষ ও মহিলার হার ছিল যথাক্রমে ২৫.৮% ভাগ এবং ১৩.২% ভাগ।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ২৪.৯% ভাগ। পুরুষ ও মহিলার হার ছিল ৩০% এবং ১৯.৫% ভাগ।

২০০১ সালের আদমশুমারি এ রিপোর্টে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৪২.৫% ভাগ বলে উল্লেখ করা হয়।

২০১১ সালের আদমশুমারি ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার প্রায় ৫২% ভাগ। নারী শিক্ষার হার এসময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এসময়ে পুরুষ ও নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ৫৪.১% ও ৫৯.৪% ভাগ।

২০২২ সালের আদমশুমারি: ২০২২ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬% ভাগ। নারী শিক্ষার হার ৭২.৮২% ভাগ এবং পুরুষ ৭৬.৫৬% ভাগ।

বাংলাদেশের সাক্ষরতার চিত্র দেখলে একথা স্পষ্ট হয় যে, এদেশের সাক্ষরতার হার এখনও কাঙ্ক্ষিত হার অর্জন করতে পারেনি। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনও নিরক্ষর। তবে জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধি হার সত্ত্বেও উন্নয়নশীল একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্জন অনেক বেশি-ই বলতে হয়। বিশেষত নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন প্রশংসার যোগ্য।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার কারণ

বাংলাদেশের একটি প্রাচীন সামাজিক সমস্যা হলো নিরক্ষরতা। এ নিরক্ষরতাকে জাতীয় অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এর পশ্চাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেকগুলো কারণ দায়ী। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো-

১. দারিদ্র্য: দারিদ্র্যকে বাংলাদেশের নিরক্ষরতার প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। দারিদ্র্যের কারণেই অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না। বিদ্যালয়ে পড়াশুনার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করতে পারেন না বলে অনেক অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে দিতে পারেন না। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত অনেক পরিবার সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কাজ করার জন্য পাঠায়। দারিদ্র্যের কারণে এরূপ অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে যায় না বা ঝরে পড়ে।

২. মা-বাবার নিরক্ষরতা: বাংলাদেশে নিরক্ষরতার অপর একটি কারণ হলো অভিভাবকের নিরক্ষরতা। নিরক্ষর মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে অজানা পরিবেশে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী নন। তারা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত নয় বলেই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় না। অনেক সচ্ছল পরিবারকেও দেখা যায়, নিরক্ষরতার দরুন সন্তানকে স্কুলে পাঠায় না।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার কারণ

৩. বেকারত্ব: শিক্ষায় বিনিয়োগ একটি লাভজনক বিনিয়োগ। তাত্ত্বিকভাবে একথা প্রযোজ্য হলেও বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দেখে এতে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। গ্রামের অনেক অভিভাবক শিক্ষিত বেকারদের হতাশা দেখে তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। শিক্ষিত বেকারুদেরকে সমাজের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ এ শিক্ষিত বেকারদের অনেকের অর্জিত সার্টিফিকেটের সাথে অর্জিত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকলেও স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর অভিভাবকরা তা উপলব্ধি করতে পারেন না।

৪. পেশাগত বৈচিত্র্যহীনতা: আমাদের দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পেশা কৃষি যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো প্রয়োজন হয় না। অথচ গবেষণায় দেখা গেছে, সাক্ষর কৃষকেরা কৃষিকাজে বেশি লাভবান হতে পারেন। পৈতৃক পেশার প্রতি যাদের আগ্রহ আছে, তাদের জন্য শিক্ষার দরকার হয় না। আবার পড়ালেখা শেখালে সন্তান পরিবারের বাইরে চলে যাবে বলে অনেক কৃষক পরিবার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। এ কারণেও শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়।

৫.সামাজিক বাধা: আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক পরিবেশ ও কুসংস্কারের জালে বন্দী হয়ে অনেক নারীই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার কারণ

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা: বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে প্রতিটি শিশুর বাড়ি থেকে ১.৫ কি.মি. হাঁটাপথের দূরত্বের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখনও অনেক চরাঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, হাওড় এলাকা এবং পশ্চাৎপদ এলাকা রয়েছে, যেখানে এ দূরত্বে বিদ্যালয় নেই। সেসব অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৭. যৌন হয়রানি: বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যৌন হয়রানি একটি বড় সামাজিক সমস্যা। বখাটেদের যৌন হয়রানির ফলে অনেক মেয়েকে শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে হয়। যে কারণে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

৮. বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ না থাকা: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরটিতে সরকারের ভূমিকাই বেশি। কিন্তু এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুবান্ধব নয়। বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া আইনগতভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও তা মানা হয় না। শিক্ষকদের যথাযথ মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি জানা থাকে না কিংবা উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় না। ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক করতে ব্যর্থ হন অনেক শিক্ষক।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার কারণ

৯. শিক্ষা উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি: সরকারি উদ্যোগে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হলেও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণের দাম অনেক বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান হারে এরূপ বর্ধিত ব্যয় নিরক্ষরতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। ১৯৭৬-৭৭ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে শিক্ষা উপকরণের ব্যয় ৩ গুণ বেড়েছে। ২০১১ সালের হিসাবে ১৯৯০-৯১ সালের তুলনায় তা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭-৭.৫ গুণ। যদিও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু এ বৃদ্ধি হার অনেক বেশি। আবার পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা চালু হওয়ার ফলে শিক্ষার পরোক্ষ ব্যয় যথা- প্রাইভেট টিউশন, কোচিং ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

১০. বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা: বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরে ১১ ধরনের বিদ্যালয় আছে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্য তৈরি করেছে। এছাড়া শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। ফলে শিক্ষা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চল ধনী-দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষার পার্থক্য দেখা যায়। আবার একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভবত ১২ বছরের শিক্ষাচক্রে ৪টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ নেই। এসব বিষয় বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে, যা নিরক্ষরতা ও ঝরেপড়ার কারণ।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার কারণ

১১. কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকে বলে থাকেন কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই ব্রিটিশ শাসনকে পোক্ত করতে যে কর্মবিমুখ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার আধুনিক সংস্করণ। বাস্তব চাহিদা পূরণে এ শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম নয়। তাই এরূপ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বেকারত্ব ও হতাশার মাত্রা অনেক বেশি দেখা যায়, যা অন্যদেরকে শিক্ষাগ্রহণে অনাগ্রহী করে তোলে।

১২. পর্যাপ্ত বৃত্তি ও প্রণোদনার অভাব: দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয়ে আনা এবং ধরে রাখার জন্য যে উপবৃত্তি চালু আছে, তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্যও অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসে না।

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের স্বল্পতা: বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়ন না ঘটালে Sustainable (টেকসই) নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ। ব্যাপক প্রচারণা, সভা-সমাবেশ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে। এরূপ পদক্ষেপের স্বল্পতাও বাংলাদেশে নিরক্ষরতার জন্য দায়ী।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার প্রভাব

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের একটি বড় সামাজিক সমস্যা। এটি আরও অসংখ্য সমস্যার জন্মদাতাও বটে। নিরক্ষরতার কতিপয় প্রভাব বর্ণনা করা হলো-

১. জনসংখ্যা সমস্যা: বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে নিরক্ষরতাকে দায়ী করা হয়। একটি শিক্ষিত দম্পতি পরিবার ছোট রাখতে যতটা সচেতন, নিরক্ষর দম্পতির নিকট ততটা প্রত্যাশা করা যায় না। সাক্ষরতা তথা শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, আত্মোপলব্ধি জাগায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি, সেখানে দেখা যায় নিরক্ষরতার সংখ্যাও অধিক।

২. দারিদ্র্য: শিক্ষা মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ায়, মানুষকে সম্পদে পরিণত করে। নিরক্ষর মানুষ অতিরিক্ত আয়-উপার্জন করতে পারে না। তার সক্ষমতা ও গুণাবলির পূর্ণতা পায় না। যে কারণে তার আয়ত্ত কম থাকে। আর এরূপ ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয় না।

৩. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা: নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা-ই হলো যাবতীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মূল। নিরক্ষর মানুষ যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখে না। বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে সে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার প্রভাব

৪. বেকারত্ব: যেকোনো দেশেই বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য দায়ী থাকে নিরক্ষরতা। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির দেরিতে হলেও দেশ-বিদেশে যেকোনো স্থানে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে সে সম্ভাবনা থাকে না। নিরক্ষরতা ব্যক্তির উৎপাদনশীলতাকেও নষ্ট করে দেয়।

৫. সুশাসনের পথে অন্তরায়: বাংলাদেশের ন্যায় ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশের নিরক্ষর জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। এ সুযোগে শাসক দল নিজেদের ইচ্ছামতো স্বৈরাচারী আচরণ করার সুযোগ নেয়। জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলে সচেতনতা বাড়ত, রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেত। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু নিরক্ষরতা সুশাসনের পথে অন্তরায় তৈরি করে রেখেছে।

৬. জনস্বার্থের অনুন্নয়ন ও পুষ্টি সমস্যা: শিক্ষা ব্যতীত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সম্ভব নয়। উপযুক্ত পুষ্টিজ্ঞান না থাকলে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হয় না। ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা যায়।

৭. অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি: নিরক্ষর ব্যক্তির আয়-উপার্জনের পথ সীমিত। যে কারণে সে সহজেই অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের জন্য অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা অনেকটা দায়ী। অন্যদিকে, শিক্ষা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর উন্নতি ঘটিয়ে তাকে সামাজিক করে তোলে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

নিরক্ষরতা একটি দেশ, সমাজ তথা জাতির জন্য মারাত্মক অভিশাপস্বরূপ একটি সামাজিক সমস্যা। রাতারাতি এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তারপরও দেশকে এ অভিশাপ থেকে রক্ষা করে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. জীবনমানের উন্নয়ন: দারিদ্র্য মোচন করতে না পারলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব নয়। স্কুলে পাঠানো এবং পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করার মতো আর্থিক যোগ্যতা যাতে জনগণের হয়, তার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন।

২. বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আইনের দুর্বলতা এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে শিথিলতা আছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

৩. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্ম নেবে যে, শিক্ষাগ্রহণের ফলে তাদের সন্তানরাও চাকরি পাবে। এতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এজন্য প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

৪. আধুনিক জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা: গতানুগতিক জীবনের চেয়ে উন্নত জীবনের প্রতি গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে পারলে তারা উন্নয়নের প্রতি উৎসাহিত হবে। এরূপ জীবনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা আয় বৃদ্ধি করে তাদেরকে এরূপ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তাই এরূপ সচেতনতা বাড়াতে হবে।

৫. বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বয়স্ক শিক্ষার হার বাড়লে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এতে সার্বিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। বয়স্কদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ পাঠ্যসূচি অনুসারে এরূপ শিক্ষার আয়োজন করা প্রয়োজন।

৬ শিক্ষার উপকরণ সহজলভ্য করা: শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত শিক্ষা ঋণ ও শিক্ষা সহায়ক প্রকল্প চালু করা প্রয়োজন। এতে দরিদ্র পরিবারগুলো শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।

৭. নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কর্মজীবী শিশুদের জন্য নৈশকালীন বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। চাহিদা ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রাম এবং শহরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশু, বস্তি ও রাস্তার শিশু এবং কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে নৈশ বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক কার্যকর।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

৮. পেশার সাথে সংগতিপূর্ণ শিক্ষার প্রসার দেশে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য শুধু তত্ত্বীয় শিক্ষা নয়, সাক্ষরতা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। কর্মজীবী মানুষ যাতে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়, বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনা সেই অনুসারে করতে হবে।

৯. জনসচেতনতা: নিরক্ষরতা একটি সামাজিক সমস্যা। তাই এটি দূরীকরণ হলো সমাজের দায়িত্ব। প্রতিটি সচেতন স্বাক্ষর ব্যক্তির উচিত নিরক্ষরতা দূরীকরণে এগিয়ে আসা। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণে যাতে সবাই এগিয়ে আসে সেজন্য উদ্যোগ নিতে হবে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে যদি একজন সাক্ষর ব্যক্তি সাক্ষরতা দান করে, তবে দেশে নিরক্ষরতা থাকতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগ।

১০. নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি: মেয়েদের শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটলে মা শিক্ষিত হবে। আর একজন মা শিক্ষিত হলে তার সন্তান নিরক্ষর হতে পারে না। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক। নারীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে সেই অনুপাতে যদি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যরাও উৎসাহিত হবে। নারী শিক্ষার প্রসার এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

১১. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ উন্নত নয়। অনুন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। তাই প্রয়োজনীয় সড়ক ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নত করলে পশ্চাৎপদ এলাকার জনসাধারণ শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে।

১২. বিদ্যালয়ের সময়সূচির পরিবর্তন: বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারাদেশে একই সময়সূচি ও ছুটির তালিকা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে এ ছুটির বিন্যাস প্রয়োজন। কেননা শীতকালীন ছুটি যে সময় দেওয়া হয়, হাওর অঞ্চলের পরিবেশ তখন বিদ্যালয়ের জন্য সবচেয়ে উপযোগী থাকে। আবার বর্ষাকালে এসব বিদ্যালয়ে ক্লাস পরিচালনা করা কষ্টকর। অথচ তখন বিদ্যালয় চালু থাকে। অন্যদিকে, কৃষকের ধান মাড়াইয়ের সময় বিভিন্ন অঞ্চলের
শিক্ষার্থীদের পরিবারে সহায়তা করতে হয় বলে বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে হয়তোবা তাদের কোনো কাজ থাকে না। এসব সমস্যার কারণে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং নিরক্ষরে পরিণত হয়। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি এবং ছুটির তালিকা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের বেকারত্বের ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

# বাংলাদেশের বেকারত্বের ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# বাংলাদেশের বেকারত্বের ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার



যে ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক ও মেধাগত দিক দিয়ে কাজের জন্য যোগ্য এবং কাজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যখন কাজ পায় না সেই বেকার। আর তার অবস্থাকে বেকারত্ব বলে। বেকারত্ব হলো কোনো সমাজে কর্মক্ষম লোক থাকা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের অভাব।

সাধারণ অর্থে কর্মসংস্থানের অভাবজনিত পরিস্থিতিকে আমরা বেকার বলে অভিহিত করি। বিভিন্ন মনীষিগণ বেকারত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিচে কয়েকজনের সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো-

লর্ড বেভারিজ (Beveridge) বেকারত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "ব্যক্তি যখন কাজ করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরও কোনো কাজ পায় না তখন তাকে বেকার বলে।"

কার্ল প্রিব্রামের মতে, বেকারত্ব হলো শ্রমবাজারের এমন এক পরিস্থিতি, যেখানে চাকরির সংখ্যা থেকে শ্রমের সরবরাহ বেশি।

ডি. মিলো বলেন, "প্রত্যাশিত পেশা বা বৃত্তিলাভে বঞ্চিত কর্মক্ষম ব্যক্তিদের বেকার হিসেবে অভিহিত করা হয়"

অধ্যাপক এ.সি.পিগু (A. C. Pigu) বলেন, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ পায় না তখন উক্ত অবস্থাকে বেকারত্ব বলে।"

বেকারত্বের বৈশিষ্ট্য

বেকারত্বের সার্বিক দিক বিবেচনায় কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো-

# একটি সর্বজনীন সামাজিক সমস্যা হলো বেকারত্ব।

# বেকারত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

# বেকারত্ব হলো যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কর্মহীনতা।

# প্রকৃতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বেকারত্ব হলো অর্থনৈতিক সমস্যা।

# বেকারত্বের ফলে একাধিক সমস্যার জন্ম হয়।

# বাংলাদেশের বেকারত্বের ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার



আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক যুগে প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যের বিচারে মানুষের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি ভিন্নতর। এদেশের মানুষের কাজের পরিধি বা ক্ষেত্র সীমিত। আবার এর বিপুল জনসংখ্যার এক বড় অংশ কর্মক্ষম হলেও কাঙ্ক্ষিত কাজ পায় না বলে বেকার। অর্থাৎ বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বেকারত্বের অভিশাপ বহন করছে। আবার, ছদ্ম বেকারত্বও বিদ্যমান রয়েছে আমাদের সমাজে। এর দ্বারা বোঝায় ৫ জনের স্থলে ৭ জন মিলে একটি কাজ করার প্রেক্ষাপটকে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। এদেশের ১৫.৫৮ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +) ৫.৪১ কোটি (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪)। কিন্তু সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, অনুন্নত কৃষি, অনগ্রসর শিল্প, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণে এদেশে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান গড়ে ওঠেনি। বিপুল এ কর্মশক্তির ৯.৩% ভাগ বেকারত্বের বোঝা বহন করে চলছে। কর্মসংস্থান জরিপ অনুসারে মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +) = ৫.৪১ কোটি। তন্মধ্যে পুরুষ-৩.৭৯ কোটি এবং মহিলা-১.৬২ কোটি। মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে কৃষি-৪৭.৩০%। শিল্প-১৭.৬৪% এবং সেবা-৩৫.০৬%।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪

## বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান অনেক কম। যে কারণে বেকারের সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক বেশি। এর প্রধান কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. অধিক জনসংখ্যা: বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল একটি দেশ। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশে প্রায় ১৫ কোটি জনগণ বাস করে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে ১,০১৫ জন জনগণ। বিপুল এ জনসংখ্যা বাংলাদেশের অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মতো বেকারত্বের জন্যও দায়ী। কেননা জনসংখ্যার অনুপাতে এখানে কাজের সুযোগ সীমিত। উচ্চ জন্মহারের সাথে সাথে বেকারত্বের হারও এখানে ক্রমবর্ধমান।

২. কর্মের সীমিত সুযোগ: একদিকে অধিক জনসংখাঁ, অন্যদিকে কাজের স্বল্পতা-এ দু উপাদান মিলে বাংলাদেশের বেকারত্বের হারকে চরম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। কাজের সুযোগ সীমিত হওয়ার দরুন অসংখ্য তরুণ কর্মহীন বেকার দিন কাটাচ্ছে।

৩. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি: এখন পর্যন্ত কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। GDP-তে একক খাত হিসেবে কৃষির ভূমিকা সর্বোচ্চ। কিন্তু কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব না হওয়ার ফলে কৃষিরও প্রসার ঘটেনি। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল এদেশের কৃষকদের বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ই কেবল কৃষিকাজ থাকে। বছরের অন্যান্য সময় এরা বেকার হয়ে পড়ে। এরূপ মৌসুমি কৃষিজ বেকারত্ব বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের বড় অপচয়।

## বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ

৪. শিল্পের অনগ্রসরতা: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারলে শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপক মাত্রায় সম্ভব ছিল। কিন্তু তৈরী পোশাক শিল্পের ন্যায় অন্যকোনো শিল্পের প্রসার এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঘটেনি। বাংলাদেশে বেকারত্বের জন্য এ কারণটিও দায়ী।

৫. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা: আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বলা হয় 'কেরানি' তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা। প্রচলিত এ শিক্ষাব্যবস্থাও বেকারত্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী। এতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কোনো কার্যক্রম নেই। কারিগরি শিক্ষার সুযোগও সীমিত।

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের নিয়মিত দুর্যোগ হলো বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা ইত্যাদি যা অনেক মানুষকে কর্মচ্যুত করে।

৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ বাংলাদেশের নিত্যদিনের চিত্র। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বরাবরই ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প, বিনিয়োগ ইত্যাদির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে। এজন্য বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, বিদেশি বিনিয়োগ আসে না, অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

## বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ

৮. প্রচলিত মূল্যবোধ: আমাদের সমাজে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধও বেকারত্বের জন্য দায়ী। নারীদেরকে মনে করা হয় তারা কেবল ঘরে থাকবে। বংশমর্যাদা, কৌলীন্য ইত্যাদির কারণে ছোটখাটো কাজকে অবমাননাকর মনে করা হয়। যে কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

৯. দারিদ্র্য: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০% ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্র্য বেকারত্বের কারণ, আবার বেকারত্বও দারিদ্র্য সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র বলে তাদের আয় কম। যে কারণে সঞ্চয়ও কম। আর সঞ্চয় কম হওয়ার দরুন বিনিয়োগ কম, যা অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে না। ফলে বেকারত্ব বেড়েই চলছে।

১০. চাকরির মোহ: এদেশের মানুষের মধ্যে চাকরির প্রতি মোহ অনেক বেশি। আত্মকর্মসংস্থান বা স্বকর্মসংস্থানের জন্য চাকরিকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিয়ের বাজারেও উদ্যোক্তাদের চেয়ে চাকরিজীবীদের কদর বেশি। তাই সবাই চাকরি পেতে চায়। বেকারত্বের জন্য এটি কম দায়ী নয়।

১১. নিরক্ষরতা: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন- অসংখ্য লোক নিরক্ষর। দক্ষ লোকের অভাব থাকা সত্ত্বেও এ নিরক্ষর লোকগুলো বেকার থেকে যায়।

## বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ

১২. ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা: বেকার সমস্যার জন্য সরকারি পরিকল্পনার ত্রুটিও অনেকাংশে দায়ী। সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা সাময়িক বেকারত্ব দূর করতে পারলেও চূড়ান্তভাবে সফল হচ্ছে না। অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি বিনিয়োগ বেশি হওয়ার ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে না।

১৩. জনশক্তি রপ্তানির অভাব: বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব ও শ্রমশক্তি রপ্তানির সরকারি বিধিনিষেধের জটিলতা, দুর্নীতি, অবহেলা প্রভৃতি কারণে জনশক্তি রপ্তানি কাঙ্ক্ষিতসংখ্যক হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে।

১৪. মূলধনের অভাব: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আয় কম বলে সঞ্চয়ের হারও কম। উন্নত দেশের যেখানে ২০-৩০ ভাগ সঞ্চয় থাকে, আমাদের দেশে সেখানে তা মাত্র ৯% ভাগ। ফলে বিনিয়োগ কম হয় এবং কর্মসংস্থানও কম।

## বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যায়-

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা: বাংলাদেশের বেকারত্বের মূল কারণ যেহেতু জনসংখ্যা ও কর্মের সুযোগের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, তাই এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন অধিকসংখ্যক কর্মসংস্থান গড়ে তোলা। এজন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। কাজের পরিধি বাড়াতে হবে।

২. কৃষিব্যবস্থার আধুনিকায়ন: আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষির মৌসুমি বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব হ্রাস করা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। এছাড়া চাষ পদ্ধতির আধুনিকায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. শিল্পায়ন: শিল্পকারখানা অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে সহজেই। এদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে। ব্যাংক ও সরকারকে অর্থায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

৪. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি: মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা সম্ভব। বাংলাদেশে অনেক লোক কর্মহীন থাকলেও দেখা যায়, দক্ষ শ্রমিকের অভাব বিদ্যমান। তাই জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বকর্মসংস্থানেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

## বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়

৫. দারিদ্র্য বিমোচন: বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য ব্যাপকভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হাতে নেওয়া প্রয়োজন। কেননা দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর যদি আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়, তবে তা বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন: প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষা যাতে বেকারত্ব তৈরির কারখানা না হয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জনশক্তি রপ্তানি: আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক দক্ষ-আধাদক্ষ জনশক্তিকে বিভিন্ন দেশে রপ্তানির মাধ্যমে বেকারত্ব লাঘব করা যায়।

৮. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন: ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। কোনো বৈধ কাজকেই হেয় করা যাবে না। যেকোনো কাজই সম্মানজনক-এ ধারণা সবার মনে বদ্ধমূল করতে হবে। নারীদের কাজের সুযোগ দিতে হবে। গোঁড়ামি দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

# বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার

## This Topic is important for

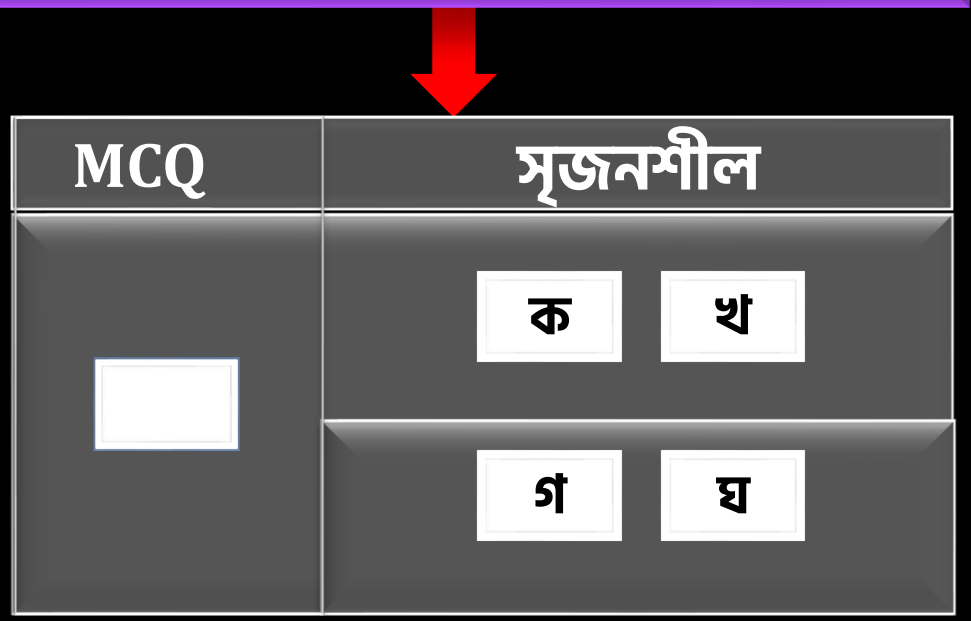

# বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার



মাদকদ্রব্যে আসক্ত ব্যক্তির অবস্থাকে মাদকাসক্তি বলে। আর মাদকদ্রব্য হলো সেইসব বস্তু যা গ্রহণ করলে কোনো ব্যক্তির (১) শরীর ও মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব রাখে, (২) আচরণে পরিবর্তন আনে, (৩) মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি নির্ভর হয়ে পড়ে।

প্রকৃতিগত দিক বিচারে সামাজিক সমস্যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও সমাজের কিছু সাধারণ সামাজিক সমস্যা লক্ষ করা যায়। মাদকাসক্তি বর্তমান সময়ে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে মাদকাসক্তির অনেকগুলো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অতীতে বাংলাদেশের সমাজে এ সমস্যাটি থাকলেও ১৯৮০-এর দশক থেকে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে এ সমস্যাটি একটি বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

# বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার



আধুনিক বিশ্বের এক বড় সামাজিক সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ মাদকের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। কেননা বিশ্বের প্রধান তিনটি আফিম উৎপাদনকারী অঞ্চল বাংলাদেশের খুব কাছে অবস্থিত। তাই বাংলাদেশ মাদকদ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা এবং ট্রানজিট অঞ্চল হিসেবে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের অসংখ্য ফেনসিডিল তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে, যা মূলত বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে মাদক উৎপাদন করে। থাইল্যান্ড থেকে মায়ানমার হয়ে মরণনেশা ইয়াবা ট্যাবলেট বাংলাদেশে অবাধে আসছে। এসব কারণে বাংলাদেশে মাদকের সহজপ্রাপ্যতা ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

# বাংলাদেশের মাদকাসক্ত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব এবং প্রতিকার



বাংলাদেশে মাদকাসক্তের প্রকৃত সংখ্যা বা শতকরা হার বের করা অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য সরকার কিংবা বেসরকারি সংস্থা কারও নিকট নেই। তবে পত্রপত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে মাদকের ওপর পরিবেশিত তথ্য থেকে এ বিষয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়। বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণি পাওয়া যায়। একটা শ্রেণি আছে যারা মাদকের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাদক ছাড়া এরা চলতে পারে না। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক তথ্যমতে এরূপ মাদকসেবী বাংলাদেশে প্রায় ২০ লক্ষ (২০১৩) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রয়েছে পথশিশু ও বস্তিবাসী। অপর একটি শ্রেণি হলো মাদকের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়, কিন্তু নিয়মিত মাদক নেয়। অপর শ্রেণিটি হলো যারা নিয়মিত মাদক নেয় না কিন্তু বিভিন্ন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণি দুটির প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়নি।

বাংলাদেশের সারাদেশেই মাদকাসক্ত থাকলেও গ্রামের তুলনায় শহরে এর সংখ্যা বেশি। আবার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলোতে এর সংখ্যা বেশি। বড় বড় শহর এলাকাতে এ সংখ্যা অনেক বেশি।

সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক বিন্যাসেও মাদকাসক্তের চিত্রে ভিন্নতা পাওয়া যায়। সমাজের নিম্নশ্রেণির একটা বড় অংশ মাদকসেবী হলেও বর্তমানে উচ্চশ্রেণিতেও এ সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদনে দেখা যায়, নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে মাদক গ্রহণের হার বেশি। মধ্যবিত্তে তুলনামূলকভাবে কম। মাদকসেবীদের মধ্যে অধিকাংশ ২১-৩০ বছর বয়সী।

গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকসেবীদের ৬০% ভাগ ২১-৩০ বছর বয়সী, ৫৭% ভাগ বিবাহিত, ৮৩% ভাগ কর্মমুখী, ২৭% নিরক্ষর, ১% ভাগ নারী এবং ১১% ভাগ গৃহহীন। মোট মাদকসেবীদের মধ্যে প্রায় ১৭% ভাগ মাদকসেবী হেরোইন ব্যবহার করে থাকে।'

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কারণ

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার এবং বিপুলহারে মাদকাসক্তির কারণ বহুবিধ বলে ধারণা করা হয়। এর জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রভাবকের জন্য মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। সঙ্গদোষে, কৌতূহল, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি কারণ মানুষকে মাদকের দিকে নিয়ে যায়। এসব কারণের মধ্যে প্রধান কয়েকটি বর্ণনা করা হলো-

১. ভৌগোলিক অবস্থা: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানজনিত কারণে এদেশে মাদকাসক্তির প্রসার ঘটেছে। আফিম, ফেনসিডিল উৎপাদন ও চোরাচালানের জন্য পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি অঞ্চল ও দেশ বাংলাদেশের খুব নিকটে অবস্থিত। এ কারণে এসব মাদক সরবরাহকারীদের নিকট এক বড় টার্গেট বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসব আন্তর্জাতিক চক্রের রুট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তাই মাদকের সহজলভ্যতা এদেশের সাধারণ চিত্র। এজন্য মাদকাসক্তির প্রসার ঘটেছে এখানে।

২. দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশা: বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দরিদ্র। কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ বেকারত্বের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব লক্ষ লক্ষ কর্মঠ, সক্ষম মানুষের জীবনে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে। এরূপ হতাশা একসময় এসব মানুষকে মাদকের দিকে টেনে নিয়ে যায়। হতাশা ভুলে থাকতে মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কারণ

৩. অপসংস্কৃতির প্রসার: ভিনদেশীয় অপসংস্কৃতির ফলেও এদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমা আকাশ সংস্কৃতিতে মানুষ ধূমপান ও মাদকাসক্ত দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় এর প্রভাবে নিজের অজান্তেই মানুষ মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়: এদেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মভীরু। সিংহভাগ মুসলমানের এদেশে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে মাদকজাতীয় দ্রব্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিককালে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশাসনের ঘাটতি দেখা যায়। এ দুর্বলতায় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বেড়ে গেছে।

৫. সঙ্গদোষ: মানুষ স্বভাবতই তার সঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়। নেশাগ্রস্ত ও দুশ্চরিত্র বন্ধুবান্ধবের প্রভাবে একজন মানুষ খুব সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, মাদকাসক্তি এক প্রকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আচরণ এটি সমাজের একই মূল্যবোধ ও চিন্তাচেতনার দ্বারা প্রভাবিত মানুষের মাঝে সহজেই সংক্রামিত হয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব গুণ ও সত্তার চেয়ে যেসব সঙ্গীসাথীর সাথে মেলামেশা করে ও যে পরিবেশে বসবাস করে সেগুলোর প্রভাবই তাকে মাদকাসক্তির দিকে আকৃষ্ট করে।

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কারণ

৬. কৌতূহল: মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতূহল মাদকাসক্তির বিস্তারে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে মানুষের মধ্যে এরূপ প্রবণতা দেখা যায়। মাদকবিরোধী বিভিন্ন প্রতিবেদন, নাটক, সিনেমা, প্রচারপত্র কিংবা মাদকাসক্তদের প্রতি কৌতূহলী হয়েও একজন 'মানুষ মাদক নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এসব কৌতূহল অনেককে মাদকের প্রতি আসক্ত করে তোলে।

৭. পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা: পারিবারিক সম্পর্কের গভীরতা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সন্তানসন্ততিদেরকে সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। কিন্তু এ সম্পর্ক যদি শিথিল হয় এবং পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরূপ পারিবারিক সম্পর্ক শিশুদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, হতাশা কাজ করে। তাই এরূপ পরিবারের সদস্যরা সহজেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে।

৮. সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সংকীর্ণ আচরণ মাদকের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আদর্শহীন রাজনৈতিক কার্যকলাপ, হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে মাদকের প্রতি প্রলুব্ধ করা হয়। এর ফলেও বাংলাদেশে মাদকের ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পায়।

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কারণ

৯. প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি: মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ বেচাকেনা ও চোরাকারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক দক্ষ বিভাগ রয়েছে। কিন্তু এসব বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয়হীনতা, অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা এবং আন্তরিকতার অভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পুরপুরি সফল হচ্ছে না। সেই সাথে দুর্নীতির কারণে মাদক চোরাকারবার বন্ধ করা যাচ্ছে না। মাদকের প্রসারের জন্য এটিও বড় একটি কারণ।

১০. জীবনে ব্যর্থতা মানুষের জীবন সফলতা-ব্যর্থতার এক যৌথ সম্মিলন। কিন্তু কেউ কেউ আবার নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে কোনো কাজে ব্যর্থ হলে হতাশায় ভোগে। এ হতাশা ভুলে থাকতেও অনেকে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়।

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কারণ

১১. প্রেমে প্রত্যাখ্যান: অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো ছেলে বা মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যান হলে বা দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে গেলে সে জ্বালা দূর করতে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয়। এ থেকেও মাদকাসক্ত হয়ে যায় অনেকে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ: মানুষের জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ইদানীং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির অস্থিরতার কারণে অনেকে বিপথগামী হয়ে যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার পর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। এরূপ পরিবেশেও অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে থাকে।

## বাংলাদেশে মাদকাসক্তি কারণ

১৩. মূল্যবোধের অবক্ষয়: যে কোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। বস্তুত যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। আর সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে আমাদের যুব সমাজের মাঝে মাদকের নীল দংশন বেড়ে গেছে।

১৪. ধর্মীয় আদর্শের অভাব। ধর্ম পালন মানুষের আত্মিক প্রশান্তি আনে। ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলন মানুষের হতাশা, নৈরাজ্য এবং নৈতিক অধঃপতন রোধ করে। কিন্তু ধর্মীয় আদর্শের অনুশীলন আমাদের সমাজে অনেক কমে গেছে। এটিও মাদকের প্রসারে ভূমিকা পালন করে।

১৫. সুস্থ বিনোদনের অভাব। আমাদের দেশের বিভিন্ন বয়সী উপযোগী মানুষের জন্য সুস্থ ধারার বিনোদনের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির অভাবহেতু অবসর কাটানোর সুযোগ কম। এরূপ পরিবেশে মাদকদ্রব্য একসময় বন্ধুত্বের মরীচিকার মতো পাশে এসে দাঁড়ায়। এ থেকেও অনেকে মরণনেশায় বুঁদ হয়ে যায়।

## মাদকাসক্তির প্রভাব

মাদকাসক্তের গতিপ্রকৃতি, মাদকদ্রব্য সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য, সবকিছুই চিহ্নিত। তেমনি এর প্রভাবও বহুমুখী এবং চিহ্নিত। এটি যেমন একটি সামাজিক সমস্যা, তেমনি আরও বহু সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তের প্রভাব নিচে বর্ণনা করা হলো-

১. শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি: মাদকদ্রব্য মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ধ্বংস করে দেয়। একজন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে মাদক নিতে থাকলে একসময় সে শারীরিক ও মানসিকভাবে এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আর এরূপ ব্যক্তি নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। যার অধিকাংশই প্রাণঘাতী। ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ফুসফুসে পানি জমা ও প্রদাহ, অসারতা, স্মৃতিশক্তি বিলোপ, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, স্নায়ুতান্ত্রিক অসারতা ইত্যাদি মাদক গ্রহণের ফলেই হয়। এছাড়া মানসিক উদ্যমহীনতা, হতাশা, নৈরাশ্য, এমনকি মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদিও মাদক গ্রহণের ফলে দেখা যায়।

২. পারিবারিক ক্ষতি: মাদকাসক্তির একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। একটি পরিবারের সদস্য মাদকাসক্ত হলে সেই পরিবারে পারিবারিক অশান্তি, কলহ, মারামারি, দায়িত্ব পালনে অবহেলা পরিবারটিকে কুরে কুরে খায়। মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ভাঙন, শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি প্রকট আকার ধারণ করে। মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে মা-বাবা, কিংবা পিতার হাতে সন্তান স্ত্রী খুন হওয়ার মতো বেশকিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে মাদকের ভয়াবহতা দেখিয়ে দেয়।

## মাদকাসক্তির প্রভাব

৩. আর্থসামাজিক ক্ষতি: মাদকাসক্তের অর্থনৈতিক ক্ষতির হিসাব চমকে যাওয়ার মতো। ২০১১-১২ সালের এক হিসাবমতে, এসময়ে তামাক ও মাদকজাত দ্রব্যের পেছনে বাংলাদেশে আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে পদ্মা সেতুর মতো ৭-৮টি বৃহত্তর অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিটি স্তরে মাদকের ভয়াল থাবার ক্ষতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে চূড়ান্ত বিচারে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদকের জন্য টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, দুর্নীতির মতো অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া নিত্যদিনের ঘটনা। এসব ব্যক্তির পতিতালয়ে গমন, পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। মাদকস্বৌদের সাথে জুয়া এবং চোরাকারবারির সম্পর্কও প্রমাণিত হয়েছে।

৪. যুব সমাজের ক্ষতি: সর্বনাশা মাদক দেশের সম্ভাবনাময় আগামী দিনের জাতির কর্ণধার যুব সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। কোটি কোটি তারুণ্য মাদকের ভয়ানক থাবায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, মাদকসেবীদের ৭০% ভাগেরই বয়স ২১-৩০ বছরের মধ্যে।

## মাদকাসক্তির প্রভাব

৫. সামাজিক সমস্যার কারণ: মাদকাসক্তি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী। এ থেকেই উৎপত্তি হয় কিশোর অপরাধ, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি, লুট, পতিতাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, চোরাচালান, দুর্নীতি, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, ধর্ষণ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা। মাদকসেবীদের একটি বড় অংশ জুয়ারি।

৬. অবৈধ ব্যবসায়: মাদকদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদন-বিতরণ একটি অবৈধ কাজ। এটি চোরাকারবারিকে উৎসাহিত করে। মাদকের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বর্তমানে একটি মাল্টি মিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে।

৭. দুর্ঘটনা: বাংলাদেশে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় লক্ষাধিক লোক হতাহত হয়। ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ। এর একটি বড় অংশ সংঘটিত হয় মাদকাসক্ত চালকদের দিয়ে। শিল্প কারখানাতেও এজন্য দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ক্রীড়াজগতে মাদকের ভয়াল থাবা নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে।

## মাদকাসক্তির প্রভাব

৮. অপরাধ বৃদ্ধি: মাদকাসক্তি সমাজে বিভিন্ন অপরাধ বাড়িয়ে দেয়। একজন মাদকসেবী বিচার বুদ্ধিহীনভাবে কাজ করে। তাই তার দ্বারা যেকোনো অপরাধ সংঘটন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পুলিশের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৬২% ভাগ চুরি, ৩৮% ভাগ ছিনতাই, ১৪% ভাগ ডাকাতি, ২০% ভাগ অবৈধ যৌন সম্পর্ককারী অপরাধী মাদকসেবী।

৯. ব্যাধির বিস্তার (HIV/AIDS): সংক্রমণের চরম ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণির মধ্যে মাদকসেবীরা রয়েছে। একই সুই সিরিঞ্জের মাধ্যমে বিভিন্ন মাদক গ্রহণের ফলে দ্রুত AIDS ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া হেপাটাইটিস B, C সহ বিভিন্ন রক্তবাহিত রোগ এদের মাধ্যমে ছড়ায়।

১০. শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর প্রভাব: সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার পরিবেশকে মাদকের ভয়াল নেশা ধ্বংস করে দেয়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষত কতিপয় নামধারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেন মাদকের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এ মরণনেশা কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে মাদকদ্রব্য। আবার মাদকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তারা জড়িয়ে পড়ছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে।

## মাদকাসক্তির মোকাবিলায় উপায়

মাদকের সমস্যাটি বাংলাদেশের সমাজের অনেক গভীরে মূল গেড়ে বসেছে। এ সমস্যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। সুন্দর, সুস্থ ও সৃজনশীল, প্রতিভা এবং তারুণ্যকে ধ্বংসকারী মাদকের এ ছোবল থেকে রক্ষা করতে না পারলে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে চরম মূল্য দিতে হবে। সমস্যাটির গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং প্রকৃতি অনুধাবন করে একে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

১.মাদকের সরবরাহ কমানো মাদকের প্রচার ও প্রসারের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হলো এর 'সহজলভ্যতা। হাতের কাছে মাদকদ্রব্য না পেলে অনেকেই হয়তো বা এপথে পা বাড়াতো না। মাদকের সহজলভ্যতা রোধ করা গেলে এর প্রকোপ অনেক কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিলে সহজেই মাদকের সরবরাহ কমানো সম্ভব।

২. আইনের যথাযথ প্রয়োগ: বাংলাদেশে মাদক নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন আছে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি দুর্বল হওয়ার ফলে একে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আইনগত কার্যক্রমকে শক্তিশালী করে এর যথাযথ প্রয়োগ মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

## মাদকাসক্তির মোকাবিলায় উপায়

৩. সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা: পারিবারিক পরিবেশ যদি সুন্দর, সৌহার্দপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ হয়, তবে সেই পরিবারের কেউ মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। পারিবারিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আস্থা, দায়িত্বসচেতন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে মাদকের সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন।

৪. সামাজিক পরিবেশ উন্নত করা: সামাজিক অস্থিরতা মাদকাসক্তকে উৎসাহিত করে। আবার যদি সামাজিক পরিবেশ সুষ্ঠু ও সৌহার্দপূর্ণ হয়, তবে এ সমস্যা মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়। তাই সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং পরিবেশ উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: দরিদ্র ও বেকারত্বের গ্লানি থেকে রক্ষা করা গেলে অনেক যুবক মাদকের ভয়াল থাবার শিকার হতো না। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উপায়ে ব্যাপকসংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেক্টরে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য কমে আসবে। এতে যুব সমাজের মধ্যে হতাশা কেটে যাবে। মাদকাসক্ত হ্রাসে এটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

৬. ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা: ধর্ম মানুষকে পরিশীলিত করে। ধর্মচর্চার মাধ্যমে মানুষ মাদকের ভয়াল নেশা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। যুবক ও তরুণ শ্রেণির মধ্যে যদি ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করা যায়, তবে তারা মাদক থেকে বিরত থাকবে এ আশা করা যায়।

## মাদকাসক্তির মোকাবিলায় উপায়

৭. প্রচারণা: মাদক থেকে মুক্তি থাকার জন্য সমাজে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। পত্রপত্রিকা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে।

৮. সমাজ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা: সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ইমাম, চেয়ারম্যান, দলপতি প্রভৃতি নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাদকবিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাদের তত্ত্বাবধানে মাদক বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হতে পারে। এটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হতে পারে।

৯. চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা: মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা সমাজের চোখে ঘৃণিত। অনেকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এদের কেউ কেউ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেয়েও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অসুস্থতার জন্য সমাজে ফিরতে পারে না।

- ধূমপান

'ধূমপান' শব্দটি 'ধূম' এবং 'পান' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। ধূম হলো 'ধোঁয়া' বা বাষ্পের প্রতিশব্দ। যেহেতু তামাকজাতীয় পদার্থের ধোঁয়া গ্রহণ করা হয় বা পান করা হয়, তাই একে 'ধোঁয়া পান' করা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সে হিসেবে ধূমপান শব্দটি গঠিত হয়।

ধূমপান হচ্ছে তামাকজাতীয় দ্রব্যাদি বিশেষ উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শ্বাসের সাথে তার ধোঁয়া শরীরে গ্রহণের প্রক্রিয়া। সাধারণ যেকোনো দ্রব্যের পোড়ানো ধোঁয়া শ্বাসের সাথে প্রবেশ করলে তাকে ধূমপান বলা গেলেও মূলত তামাকজাতীয় দ্রব্যাদির পোড়া ধোঁয়া গ্রহণকেই ধূমপান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণসহ মোটামুটি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, ধূমপান যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ নানা রোগের অন্যতম প্রধান কারণ এবং ধারক ও বাহক।

ধূমপানের প্রকারভেদ

# সক্রিয় ধূমপান: ধূমপায়ী যে অবস্থায় জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি থেকে উদ্ভূত ধোঁয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে টেনে সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করায় তাকে সক্রিয় ধূমপান বলে।

# নিষ্ক্রিয় ধূমপান: ধূমপানের সময় ধোঁয়ার যে অংশ চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনৈচ্ছিকভাবে মানুষের দেহে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে তাকে নিষ্ক্রিয় ধূমপান বলে।

## ধূমপানের কুফল

গবেষণায় দেখা গেছে সিগারেটের ধূমপানে নিকোটিনসহ নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বিরাজমান। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বের ১৯২টি দেশে পরিচালিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিজে ধূমপান না করলেও অন্যের ধূমপানের (পরোক্ষ ধূমপান) প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায়, ৬,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ১,৬৫,০০০-ই হলো শিশু। শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের কারণে নিউমোনিয়া ও অ্যাজমায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগও দেখা দেয়। গবেষণায়ও এও বেরিয়ে এসেছে যে, পরোক্ষ ধূমপান পুরুষের তুলনায় নারীর উপর বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৮১,০০০ নারী মৃত্যুবরণ করেন। এর আগে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত এজাতীয় আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ৪০% শিশু, ৩৩% অধূমপায়ী পুরুষ এবং ৩৫% অধূমপায়ী নারী রয়েছেন। তাতে এও ফুটে ওঠে যে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছেন ইউরোপ ও এশিয়ার মানুষ।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী মিউটাজেন থাকে। এরা মানুষের মুখ, শ্বাসনালি, গ্রাসনালি এবং ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এছাড়া ধূমপান থেকে শ্বাসনালিতে প্রদাহ এবং কাশির সৃষ্টি হয়। একে ব্রংকাইটিস বলে। এতে শ্বাসনালি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়। হাঁপানি শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি হয়। ফুসফুস অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হয়।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর; যেহেতু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Conention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করে এবং যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলি বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু ১৫ মার্চ, ২০০৫ তারিখে আইন প্রণয়ন করা হয় যা ২ মে, ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। উক্ত আইনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারা নিচে উল্লেখ করা হলো।

এ আইনের কতিপয় সংজ্ঞা

ধারা: ২। (খ) 'তামাক' অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদসম্পর্কিত অন্য কোনো উদ্ভিদ বা উহাদের কোনো পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোনো অংশ বা অংশবিশেষ। (গ) 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোনো দ্রব্য, যা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (ঘ) 'ধূমপান' অর্থ কোনো তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোনো প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (চ) 'পাবলিক প্লেস' অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্রে (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন,

রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোনো স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যেকোনো বা সকল স্থান। (ছ) 'পাবলিক পরিবহন' অর্থ মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যেকোনো যান।

পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ

ধারা: ৪। (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি কোনো পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করিতে পারিবেন না। (২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান

ধারা: ৫। (১) কোনো ব্যক্তি- (ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোনো বই, লিফলেট,হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোনোভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না; (খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোনো নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না; (গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোনো দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না; (ঘ) কোনো প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না; (ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোনো সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্যচিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রচার,

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোনো দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট, বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না; (ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোনো উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।

ব্যাখ্যা-উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। (২) উপ-ধারা (১)-এর দফা (ঙ)-এর কোনো কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষাবিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। (৩) কোনো ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (Corporate Social Responsibility) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকাণ্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবে না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না। (৪) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ

ধারা: ৬। (১) কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিতে পারিবেন না। (২) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ ইত্যাদি

ধারা: ৬ক। (১) কোনো ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোনো ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না। (২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

**ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা**

ধারা: ৭। (১) কোনো পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোনো পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন। (২) কোনো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ইত্যাদির দায়িত্ব**

ধারা: ৭ক। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধিবিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শন

ধারা: ৮(১) ধারা ৭-এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সংবলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। (২) কোনো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ ইত্যাদি

ধারা: ১০। (১) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অন্যূন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙিন ছবি ও লেখা সংবলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মুদ্রণ করিতে হইবে। (২) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে, যথা- (ক) ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে- (অ) ধূমপানের কারণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়; (আ) ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়; (ই) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়; (ঈ) ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়; (উ) পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়; (ঊ) ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়; (খ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে-(অ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখের গলায় ক্যান্সার হয়; (আ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়; (গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সতর্কবাণী। (৩) বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় "শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত" মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে। বাংলাদেশে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন, কৌটা বা মোড়কে ব্র্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন- লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাইবে না। (৫) উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত সচিত্র সতর্কবাণী এবং উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত বিবৃতি তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় মুদ্রণ পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৬) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড ও উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

**তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান**

ধারা ১১। (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। (২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোনো ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যেকোনো সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

**তামাক ও তামাকজাতীয় ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ**

ধারা: ১২। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাকজাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৬ বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ধারণা, কারণ প্রভাব এবং প্রতিকার

# বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ধারণা, কারণ প্রভাব এবং প্রতিকার

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল | |
|---|---|---|
| | ক | খ |
| | গ | ঘ |

## বাংলাদেশের নারীর নিরাপত্তাজনিত সমস্যা

বাংলাদেশের নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান খুবই প্রান্তিক। অর্থাৎ সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান সর্বনিম্ন। এদেশে পরিবারপ্রধান পুরুষ হওয়ায় পরিবারের মুখপাত্র হিসেবে তিনি সমাজে প্রতিনিধিত্ব করেন। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পালনের কোনো সুযোগ থাকে না। পরিবারের মধ্যে কোনো নারীর পুরো জীবনটাই পুরুষের অঙুলি নির্দেশে চলে। অর্থাৎ পুরুষের নির্দেশনা ও নিরন্ত্রণে নারীর পুরো জীবনটাই পরিচালিত হয়। পুরুষের মতামতের ওপরই তার জীবনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পরিবারের কোনো কাজেই নারীর মতামত চাওয়া হয় না বা তাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এভাবেই পরিবারের মধ্যে পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্য দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও নারীর অবস্থান নির্ধারিত হয়। তবে পরিবারের মধ্যে নারী বিভিন্নভাবে পরিচিত হয় ও দিনবদলের সাথে সাথে তার অবস্থান ও পরিচিতির বদল হয়। কখনো কন্যা, কখনো স্ত্রী, কখনো মাতা, কখনোবা ভগ্নি হিসেবে পরিবারে নারীর অবস্থান নির্ণীত হয়। জীবনের সবক্ষেত্রেই নারীপুরুষের অধীন। অর্থাৎ এটাই স্বীকৃত সত্য যে, পুরুষ বিনা নারী অচল, অসহায় ও নিকৃষ্ট। পুরুষ বিনা নারীর জীবন গতিহীন। আর এরকম ভাবনা নারীকে তার জীবনের প্রারম্ভ থেকে সামাজিকভাবে অধস্তন করে রাখে। সামাজিকভাবে নারী বিভিন্ন দিক থেকে বা বিভিন্ন কারণে অধস্তনের শিকার হয়।

# বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ধারণা, কারণ প্রভাব এবং প্রতিকার



## যৌন নিপীড়ন

যৌন নিপীড়ন একটি প্রাচীন সমস্যা। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় যৌন নিপীড়নের অস্তিত্ব শুরুতেই ছিল। তাই পুরুষ সমাজ নারী সমাজের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে এবং নানাভাবে তাদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। মাতৃজাতির প্রতি অবজ্ঞা ও তাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা যৌন নিপীড়নের অন্যতম কারণ। যৌন নিপীড়ন আমাদের সমাজের নতুন কোনো ঘটনা নয়। আমরা সবাই লক্ষ করছি, সম্প্রতি যৌন নিপীড়ন খুব উচ্চহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে যেসব যৌন নিপীড়নের ঘটনা উল্লেখ থাকে তাতে আমরা আতঙ্কিত যে, আমরা আবারও মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছি কি না তা দেখার বিষয়। প্রতিদিন ধর্ষণ, হত্যা, ইভটিজিংসহ নানা ধরনের যৌন নিপীড়নমূলক ঘটনা ঘটছে।

ইভটিজিং বা যৌন নিপীড়ন বলতে কোনো পুরুষের নেতিবাচক আচার-আচরণে কোনো নারীর শারীরিক ও মানসিকভাবে যন্ত্রণার সম্মুখীন হওয়াকে বোঝায়।

## যৌন নিপীড়ন

যারা যৌন নিপীড়ন বা ইভটিজিং এর শিকার

যারা প্রতিনিয়ত ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে তারা অধিকাংশই স্কুল কিংবা কলেজগামী শিক্ষার্থী, যাদের বয়স ১৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ফলে অনেকের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক অভিভাবক মেয়ের পড়ালেখা বন্ধ করে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছেন। এটা একটা গুরুতর মানসিক অশান্তি। এরকম অশান্তি শুধু রাজধানীতেই নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদেরও মানসিক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আমাদের দেশে প্রতিদিন কত সহজ সরল মেয়ে এভাবে রাস্তাঘাটে উত্যক্ত বা ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকলেও এটা যে ভয়াবহ রূপে বিস্তার লাভকরেছে, প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করলে তা বোঝা যায়। ফলে স্কুল কলেজগামী মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঘরকুনো জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

## যৌন নিপীড়ন

যৌন নিপীড়নের কারণ

১. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা: আমাদের পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থাই যৌন নিপীড়নের অন্যতম কারণ। এ ধরনের পরিবারের নেতৃত্বে থাকেন পরিবারের বয়স্ক লোক। পিতৃপ্রধান সমাজে নারী জাতিকে খাটো করে দেখা হয়। আর সব দিক হতে তাদেরকে অবহেলা করা হয়।

২. সামাজিক অস্থিরতা: বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক অস্থিরতা দিন

দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজে দুর্নীতি, প্রতারণা, আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ কারণে ছেলেমেয়েরা দিন দিন অন্যায় পথ বেছে নিচ্ছে। যার কারণ হিসেবে যৌন নিপীড়ন দিন দিন বেড়েই চলছে।

৩. শিক্ষার অভাব যৌন নিপীড়নের একটি অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাবে তারা নীতি-নৈতিকতার পথ হারিয়ে ফেলেছে। যার কারণে যৌন-নিপীড়ন হচ্ছে।

৪. পুরুষকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা: আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরুষপ্রধান। পুরুষ সমাজের প্রধান ও সর্বময় কর্তা। তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিবারে পুরুষ যেটা বলবে সেটাই হবে। এক্ষেত্রে তারা নারীদেরকে অবহেলা করে।

## যৌন নিপীড়ন

৫. সচেতনতার অভাব: যৌন নিপীড়নের অন্যতম কারণ হলো নারীদের অসচেতনতা। দেশের অধিকাংশ নারীই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা তাদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই যৌন নিপীড়ন হয়ে থাকে।

৬. আইনের অব্যবস্থাপনা: যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনের ব্যবস্থা দেশে নেই। যারা যৌন নিপীড়ন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার অভাবে যৌন নিপীড়ন হয়ে থাকে।

৭. মিডিয়ার নিষ্ক্রিয়তা: যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে মিডিয়া প্রচার-প্রচারণা খুবই কম করে থাকে।

৮. নীতি-নৈতিকতার অভাব: বর্তমানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা নেই বললেই চলে। মাদকাসক্ত খারাপ সঙ্গীর সাথে চলা ইত্যাদির কারণে তাদের নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত হতে চলেছে। যার কারণ হিসেবে যৌন নিপীড়ন হয়ে থাকে।

৯. পিতামাতার অবহেলা: বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারের পিতামাতারা তাদের সন্তানের দেখাশুনার ব্যাপারে খুবই উদাসীন। ছেলেমেয়েরা বড় হলে কোথায় যায়, কার সাথে থাকে এ ব্যাপারে তার খবর রাখে না।

১০. ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখা: বাংলাদেশের পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরা নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখে। তারা মনে করে, নারীরা শুধুমাত্র ভোগের বস্তু। এ কারণে তারা নারীদের ওপর এরকম আচরণ করে।

## যৌন নিপীড়ন

ইভটিজিং বা যৌন নিপীড়নের প্রভাব

১. মানসিক সমস্যা: পথেঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার কারণে প্রত্যক্ষ শারীরিক ক্ষতি না হলেও এর পরিণতি ভয়াবহ হয়ে থাকে। মেয়েদের নানা মানসিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা পথে বের হলেই তারা এ উত্ত্যক্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে সবসময়। এতে তাদের মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত করে।

২. নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে: যৌন নিপীড়নের শিকার নারীদের মধ্যে এমন এক নিরাপত্তাহীনতাবোধ জন্ম দেয় যে তারা ক্রমশ কুণ্ঠিত, লজ্জিত ও মুখচোরা ও দুর্বল হয়ে ওঠে। তারা এক ধরনের হীনম্মন্যতার শিকার হয়।

৩. আত্মহত্যা করা যৌন নিপীড়নের শিকার নারীরা সবসময় হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং তারা সমাজের চোখে হেয় হয়ে যায়। আর এ লজ্জার কারণে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পত্রপত্রিকার তথ্য মতে, বিগত ৫ বছরে কমপক্ষে ২০ জন মেয়ে এজন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

## যৌন নিপীড়ন

৪. লেখাপড়া বন্ধ: যৌন নিপীড়নের ভয়ে মেয়েরা বাইরে বের হতে ভয় পায়। এ কারণে তারা স্কুলে যেতে পারে না। যার প্রভাবে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

৫. বাল্যবিবাহ দেওয়া: যৌন নিপীড়িত নারীরা সমাজের ও পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে তাদেরকে অবহেলিত জীবনযাপন করতে হয়। তাই অধিকাংশ পরিবারে পিতামাতা তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে থাকেন।

৬. কর্মজীবীর সমস্যা: যৌন নিপীড়নের কারণে কর্মজীবী মহিলাদের নানা ধরনের সমস্যা হয়। তাদের কর্মস্থলে যেতে সমস্যা হয়। অনেক সময় তারা চাকরি ছেড়ে দেন।

## যৌন নিপীড়ন

যৌন নিপীড়ন বা ইভটিজিং-এর প্রতিকার

১. ইভটিজিং-এর কুফল সম্পর্কে স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র ও স্কুল পরিচালনা কমিটিকে সচেতন করা, যাতে ইভটিজিং-এর বিরুদ্ধে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. ইভটিজিং নিয়ে পাড়াভিত্তিক জনসাধারণকে সচেতন করা এবং এ ব্যাপারে কমিউনিটি পুলিশ জোরদার করা।

৩. পাড়ায় পাড়ায় ইভটিজিং-এর স্থানগুলো চিহ্নিত করে টিজারদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান পরিচালনা করা এবং এ ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়ার জন্য পুলিশদের সচেতন করা।

৪. ইভটিজিং-এর কুফল জনগণকে জানানোর জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা।

৫. স্থানীয় ডিশ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। কারা এ ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ করার এবং শাস্তির জন্য ব্যাপক জনসচেতন সৃষ্টি করা।

৬. ইভটিজিং-এর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে চূড়ান্তমূলক আইনি উদ্যোগ গ্রহণ।

## যৌন নিপীড়ন

৭. স্থানীয় মুরব্বিদের দিয়ে পাড়ার যুবকদের এ সম্পর্কে বোঝানো এবং ইভটিজারদের সামাজিক সালিস বিচারের সম্মুখীন করা।
৮. ইভটিজিং-এর শিকার ছাত্রীরা যাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত না হয় সেজন্য বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করা।
৯. পাড়ায় পাড়ায় সুস্থ সামাজিক বিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা।
১০. ইভটিজিং বন্ধে অভিভাবকদের উদ্যোগ গড়ে তোলা।
পরিশেষে বলা যায়, ইভটিজিং বা যৌন নিপীড়ন একটি সামাজিক ব্যাধি। আর এ ব্যাধি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নারীদের অগ্রগতির পথে বড় বাধা। এভাবে চলতে থাকলে এদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা ব্যাহত হবে। দেশের সর্বোচ্চ জনগোষ্ঠীকে অর্ধশিক্ষত করে দেশ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। তাই ইভটিজিং বা যৌন নিপীড়ন বন্ধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

# বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ধারণা, কারণ প্রভাব এবং প্রতিকার



## জেন্ডার বৈষম্য

- জেন্ডার হলো সামাজিক ধারণা। অর্থাৎ সমাজ নির্বিশেষে একজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাই জেন্ডার। জেন্ডার (Gender) এবং (Sex) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার মূলত একজন পুরুষ বা নারী হিসেবে আমাদের যে সামাজিক পরিচয় সেটিকে প্রকাশ করে। সেক্স বা লিঙ্গ হলো প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য কিংবা শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য যা অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে জেন্ডার হলো সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আলোচিত নারী ও পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয়।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। মোট জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ নারী সমাজকে বাদ দিয়ে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ অনেক। নারী জাতিকে সমাজের অবহেলিত জাতি হিসেবে দেখা হয়। আর মনে করা হয় নারীরা শুধুমাত্র সারাক্ষণ ঘরে কাজ করবে - এবং ছেলেমেয়েদেরকে দেখাশুনা করবে এবং স্বামীর খেদমত করবে। ধারণাগত এ কারণে সমাজে দেখা যায় জেন্ডার বৈষম্য। যার ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং শুরু হয় পারিবারিক কলহ, দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া বিবাদ। সবশেষে নারী জাতি বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। বাংলাদেশের প্রতিটি সমাজে এ জেন্ডার বৈষম্য বিরাজ করছে। নিচে জেন্ডার বৈষম্যের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা করা হলো।

## জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্যের কারণ

১. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা: আমাদের পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থা জেন্ডার বৈষম্যের জন্য দায়ী। তার কারণ হলো এ ধরনের পরিবারে থাকে পরিবারের বয়স্ক পুরুষ। আমাদের সমাজে সন্তানের বিয়ে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে খুব কম স্বামীই স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন। এতে নারী সমাজ বঞ্চিত হয়। অনেক সময় তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে দেখা দেয় নারী পুরুষ বৈষম্য।

২. সামাজিক অস্থিরতা: বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব, হতাশা ইত্যাদি সমস্যা এবং এসবের প্রভাবও পড়ছে নারী সমাজের ওপর। যার কারণে নারী সমাজকে হেয় করে দেখা হয় এবং তাদের প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার করা হয়।

৩. অর্থনৈতিক দুর্বলতা: জেন্ডার বৈষম্যের আরেকটি কারণ হলো বাংলাদেশের নারী সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী নয়। অর্থনৈতিকভাবে নারীরা ভাই বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদেরকে এদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই স্বাধীনভাবে তারা কোনো মতামত প্রকাশ করতে পারে না। তাছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে অনেক নারী প্রতারিত হয়ে পাচার হয়ে যায় বা তাকে লোভ দেখিয়ে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি করা হয়।

## জেন্ডার বৈষম্য

৪. শিক্ষার অভাব: বাংলাদেশের নারী-পুরুষের বৈষম্যের আরেকটি কারণ হলো শিক্ষার অভাব। এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও অধিকাংশ নারী অশিক্ষিত। তার কারণ হলো এদেশের পরিবারের পিতামাতারা মনে করেন নারীদের বেশি শিক্ষিত হওয়ার দরকার নেই। সামান্য শিক্ষিত হলে তাদেরকে বিয়ে দিতে হবে। আর এ মনোভাবের কারণে জেন্ডার বৈষম্য তৈরি হয়।

৫. ধর্মীয় কুসংস্কার: বাংলাদেশের এক শ্রেণির লোক ধর্মকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে নারীকে নানাভাবে বঞ্চিত করছে। তারা পর্দা প্রথার নামে পরিবারের পুরুষরা নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নারী-পুরুষের প্রভেদ।

৬. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ: সভ্য দেশের মেয়েরা যে বয়সে বিয়ে নিয়ে চিন্তা করে সে বয়সে আমাদের দেশের মহিলারা দিদি মা অথবা ঠাকুরমা হয়ে যায়। ফলে মাত্র অল্প সময়ে স্কুলে পড়াশুনায় সুযোগ পায়। যে বয়সে তাদের পড়াশুনা করার কথা সে বয়সে তাদের স্বামীর ঘরসংসার করতে হয়। ফলে তৈরি হয় নারী-পুরুষের বিশাল ব্যবধান।

৭. পুরুষকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা: আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরুষপ্রধান। পুরুষ সমাজের প্রধান কর্তা। তাই পরিবারে স্বামীই প্রধান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারীর কোনো মূল্যায়ন থাকে না। পুরুষ যেটা বলে সেটা তাদেরকে শুনতে হয়।

## জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব

১. উন্নয়নে বাধা: জেন্ডার বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী পারিবারিক এমনকি জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যার ফলে পরিবার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

২. উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা: জেন্ডার বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের নারীদের ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। যার কারণে তারা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক জনশক্তি উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত না থাকায় আমরা দিন দিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছি।

৩. শিক্ষা থেকে বঞ্চিত: জেন্ডার বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশে নারীরা যে বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা হলো শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আর এজন্য তারা তাদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করতে পারে না।

৪. অধিকার থেকে বঞ্চিত: জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীরা তাদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

## জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার বৈষম্য নিরসনের উপায় বা প্রতিকার

১. সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা: জেন্ডার বৈষম্যরোধ করতে হলে নারীদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কেবল স্বাক্ষর দিতে জানে এরূপ শিক্ষা নয়। নারীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যাতে নারীরা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।

২. ধর্মীয় কুসংস্কার বন্ধ করতে হবে: জেন্ডার বৈষম্যরোধ করতে হলে ফতোয়াসহ নানাবিধ কুসংস্কার রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে ফতোয়াবাজদের।

৩. সুযোগের সমতা: নারী-পুরুষ সবাই সমান। সবাই সমান দায়িত্বশীল। কাজেই পুরুষ নারীর প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে সবাই একই নীতি ও কৌশল ভোগ করবে।

৪. পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন: আমাদের দেশের পুরুষের মানসিকতাই ছোট থেকে এভাবে গড়ে উঠেছে যে, তারা নারীর ঊর্ধ্বতন। সময়ের পরিবর্তন ঘটলেও পুরুষের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই পুরুষের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

৫. আইনি পদক্ষেপ: জেন্ডার বৈষম্যরোধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

## জেন্ডার বৈষম্য

৬. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহরোধ: আমাদের দেশের একটি মেয়ে কোনোকিছু বোঝার আগেই তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সে শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, পারিবারিক জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে। এরূপ বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করতে হবে।

৭. সামাজিক সচেতনতা: জেন্ডার বৈষম্যরোধে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও পাঠ্যপুস্তকে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. নারীর ক্ষমতায়ন: সর্বোপরি জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া জেন্ডার বৈষম্যরোধ সম্ভব নয়।

## যৌতুক প্রথা

যৌতুকের কারণ

১. দারিদ্র্য: অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। দরিদ্রতা যৌতুক দাবির অন্যতম কারণ। পাত্রের আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য অথবা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশায় কন্যাপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করা হয়।

২. সামাজিক ব্যবস্থা: বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এখনও পুরুষদের চেয়ে কম। স্বামীর সংসারে যাতে মেয়েদের অসম্মান করা না হয় তাই মেয়েদের পিতামাতা পাত্র পক্ষকে যৌতুক দিতে বাধ্য হয়।

৩. শিক্ষা: অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষার হার কম। বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার আরও কম। অনেক নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় না।

## যৌতুক প্রথা

৪. নারীর পরনির্ভরশীলতা: বাংলাদেশের নারী সমাজ অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ করা সমাজে গ্রহণীয় নয়। বাংলাদেশের নারী অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল। যৌতুক প্রদান করে তারা সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করে।

৫. সামাজিক দুর্নীতি: সমাজের কিছু লোক দুর্নীতি করে প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হচ্ছে। তারা ছেলেমেয়েদের বিয়েতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। তারা অর্থের বিনিময়ে মেয়ের জন্য বরনির্বাচন করে থাকে। এর ফলে যৌতুক প্রথা সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

৬. সামাজিক কুফল: বর্তমান সমাজে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। এ সুযোগে সমাজে কিছু মানুষ অনৈতিক পন্থায় প্রভৃত ধনসম্পদের মালিক হচ্ছে। এতে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যৌতুকের বিস্তৃতির পিছনে এটি অন্যতম কারণ।

৭. প্রতিষ্ঠা লাভের মনোভাব আমাদের সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলে ও তার অভিভাবকরা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লোভে যৌতুক দাবি করে। বিয়ের সময় দাবি করা হয়, মেয়ের জামাইকে চাকরি, ব্যবসায়, বিদেশে পাঠানোর টাকা দিতে হবে।

৮. পিতামাতার অবহেলা: অনেক সময় পিতামাতা কন্যাসন্তানকে বোঝা মনে করে। সেক্ষেত্রে অর্থসম্পদ দিয়ে হলেও কন্যাকে পাত্রস্থ করাই তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পিতামাতার এরূপ মনোভাব যৌতুক প্রথার একটি অন্যতম কারণ।

## যৌতুক প্রথা

৯. বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রাধান্য: দৈহিক খুঁত, অধিক বয়স, সৌন্দর্যের অভাব ইত্যাদি কারণে মা-বাবা যৌতুক প্রদান করে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে বাধ্য হন।

১০. ধর্মীয় প্রভাব: হিন্দুধর্মে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক প্রদান শাস্ত্রসম্মত হিসেবে দেখানো হয়। তার কারণ হলো পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার নেই।

১১. নারী-পুরুষ বৈষম্য: সমাজে নারীদের হীন চোখে দেখা হয়। শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলেদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। নারী-পুরুষের এরূপ বৈষম্য যৌতুক প্রথার অন্যতম কারণ।

## যৌতুক প্রথা

সমাজে যৌতুক প্রথার প্রভাব

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের মতো অধিকাংশ ঘটনাই হলো যৌতুকের মতো। তাই যৌতুক নিজে একটি অন্যতম সমস্যা ও অন্যান্য জটিল সমস্যার কারণ। এদেশে প্রতি ঘণ্টায় একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং প্রতিদিন ২৪টি নারী নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে ১০টি যৌতুক সম্পর্কীয়। (উৎস: দৈনিক ইত্তেফাক: এ. এস. নুরুল হক, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০০)। সমাজে যৌতুকের প্রভাব হলো-

১. পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা: নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে অন্যতম বাধা হলো যৌতুক প্রথা। যৌতুক লাভের আশায় পিতামাতার চাপে অনেক সময় ছেলেরা অসুন্দর ও অশিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করে। এর ফলে মানসিক সামঞ্জস্যহীনতার অভাবে পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

২. দাম্পত্য কলহ: যৌতুকের প্রভাবে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি অনেক ঘটনা সারাদেশে প্রতিদিন ঘটছে। ফলে সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবারের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৩. সর্বস্ব হারানো: কন্যা দায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতামাতাগণ যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দুস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এতে আমাদের সমাজে দরিদ্রের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## যৌতুক প্রথা

৪. যৌনাচার বৃদ্ধি: বাংলাদেশের মেয়েদের বিবাহের অন্যতম বাধা হলো যৌতুক প্রথা। সঠিক সময়ে পাত্রস্থ না হওয়ায় হতাশাগ্রস্ত নারী যৌনাচার বা পতিতাবৃত্তি বেছে নেয়। যার প্রভাবে সমাজে পতিতার হার বাড়ছে।

৫. মর্যাদাহানি: নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রধান বাধা হলো যৌতুক। অন্যদিকে হয়রানি বা অপমানিত হচ্ছে অন্য পুরুষ। সে পুরুষ কন্যার পিতা। এতে বাংলাদেশে নারীপুরুষ উভয়ই দারুণ চাপের মুখে পড়ছে শুধু যৌতুকের দাবির কারণে।

৬. হত্যা ও আত্মহত্যা: যৌতুকের কারণে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে হত্যা, আত্মহত্যা, অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে গৃহবধূরা। এর ফলে তারা বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যা। শারীরিক নির্যাতন, তালাক, বাড়ি থেকে বিতাড়িত, এসিড নিক্ষেপের মধ্য দিয়েও শান্ত না হয়ে সর্বশেষে বউ হত্যা করে আত্মতৃপ্তি হচ্ছে।

## যৌতুক প্রথা

যৌতুক প্রথার প্রতিকার বা নিরসনের উপায়

১. শিক্ষা বিস্তার: শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার প্রসার ঘটলে নারীরা পূর্বের চেয়ে সচেতন ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা লাভ করে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।

২. সচেতনতা সৃষ্টি: সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ও যৌতুকবিরোধী সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো লিফলেট, প্রচারণা এবং মিডিয়াসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

৩. নারী উন্নয়ন: নারী শিক্ষা ও মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নারীদেরকে পুরুষদের সমকক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৪. বিয়ে রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে কঠোরতা: বিবাহ রেজিস্টারগণ বিবাহকালীন যেকোনো প্রকার যৌতুক লেনদেনবিষয়ক তথ্য পেলে বিবাহ পরিহার করবেন।

## যৌতুক প্রথা

৫. যৌতুক আইনের বাস্তবায়ন: প্রচলিত সামাজিক আইন বিশেষত ১৯৮০ যৌতুকবিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সরকার পুলিশ প্রশাসনে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে।

৬. যুবকদের সচেতনতা সৃষ্টি: যুব সমাজকে যৌতুকবিরোধী মনোভাব ও আত্মসম্মান জাগিয়ে তুলতে হবে। যাতে যুবকরা বিয়ের সময় যৌতুক গ্রহণ না করে এবং অন্যদের যৌতুক না নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলে।

৭. সামাজিক উদ্যোগ: যৌতুক দাবিকারী বিয়েতে যোগদানে অনীহা বা সামাজিকভাবে বয়কট করার প্রবণতা যৌতুক প্রথা হ্রাসে সহায়ক হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এ প্রথা আমাদের সমাজে কুপ্রথা। যৌতুক নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ। যৌতুকের অভিশাপে বিবাহিত নারীর জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদের বেদনা। নির্যাতনে ঘটে জীবনের অবসান। তাই আমাদের সকলের উচিত যৌতুকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

## যৌতুক প্রথা

যৌতুক প্রথা বিরোধ আইন এবং এর শাস্তির বিধান

যৌতুক প্রথা বিরোধ আইন ১৯৮০ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রণীত হয়। যা 'যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০' নামে পরিচিত। এ আইনে বলা হয়েছে 'বিবাহে কোনো পক্ষ বাধ্য হয়ে যা (টাকা-পয়সা বা দ্রব্যাদি) প্রদান করে তাই যৌতুক।" যা না দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং নির্যাতন শুরু হয় তাই যৌতুক। এ আইনে যৌতুক আদান-প্রদান এবং আদান-প্রদানে সহযোগিতা করার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে এবং অপরাধ হলে কোনোক্রমেই শাস্তি এক বছরের কম দেওয়া যাবে না। আবশ্যক হলে অর্থদণ্ড এবং উভয় দণ্ডই দেওয়া যাবে যা ম্যাজিস্ট্রেট অবস্থানুসারে বিবেচনা করবেন। এছাড়াও এ সংক্রান্ত সকল প্রকার চুক্তি এ আইনে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০'-এ যৌতুক নিষিদ্ধ করে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, সমাজে যৌতুক প্রদান বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে।

# বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ধারণা, কারণ প্রভাব এবং প্রতিকার



## বাল্যবিবাহ

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮। আর উল্লিখিত বয়সের পূর্বের বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলে।

অপরিণত বয়সে বিবাহ তথা বাল্যবিবাহ নারী নির্যাতনের একটি বিশেষ দিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের বোঝা হিসেবে ধরা হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিয়ে দিতে পারলেই যেন সকল ঝামেলা শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, সংসার সম্পর্কে কিছু বোঝার আগেই অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। শৈশব থেকে কৈশোরে যাওয়ার আগেই শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন না হয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। এতে মেয়েদের সুন্দর শৈশবের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাল্যবিবাহের কারণে এত অল্প বয়সেই চেপে বসে বিশাল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে মেয়েরা ব্যর্থ হয়। এজন্য স্বামীর পরিবার দ্বারা তারা নির্যাতিত হয়। অপরপক্ষে যৌন জীবন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এসব মেয়ে স্বামীর দ্বারা নিগৃহীত হয়। এসব কারণে তাদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পতিত হতে হয়।

## বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের কারণ

১. পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা: বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এ কারণে দরিদ্র পরিবারের পিতামাতারা এ অভাবের জন্য মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে থাকে।

২. কুসংস্কার ও যৌতুক প্রথা: বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ হিসেবে কুসংস্কার ও যৌতুক প্রথাকে ধরা হয়। বিশেষত গ্রামের মানুষেরা মনে করে, মেয়েরা বড় হলে খারাপ হয়ে যাবে। অথবা তাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে যৌতুকের পরিমাণ বেশি দিতে হবে। তাই তারা অতি অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে থাকে।

৩. অসচেতনতা: অনেক অভিভাবক আছেন যারা বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে কিছুই জানে না। আর এ অসচেতনতার কারণে অনেক মেয়ের অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারের পিতামাতারা মনে করেন, মেয়েদের বেশি

শিক্ষার দরকার নেই। যেহেতু তারা স্বামীর ঘর সংসার করবে, তাই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আর এজন্য অল্প বয়সেই মেয়ের বিবাহ হয়ে থাকে।

## বাল্যবিবাহ

৫. স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ও অন্য গণ্যমান্যদের নিষ্ক্রিয়তা: আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বাল্যবিবাহের সম্পর্কে কিছুই বলেন না এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। যার ফলে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে।

৬. কাজিদের ওপর প্রয়োজনীয় নজরদারি না রাখা: বাংলাদেশের যেসব কাজি বাল্যবিবাহ পড়ান তাদের ওপর প্রয়োজনীয় নজরদারি অভাব এবং শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার কারণে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে।

৭. বাল্যবিবাহে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না হওয়া: বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রচুর আইন রয়েছে। কিন্তু এদের কোনোটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এখনও সেভাবে হয়নি। এতে সাধারণ মানুষের আইন জানা না থাকার কারণে বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে।

৮. নিরাপত্তার অভাব: বর্তমানে আমাদের সমাজব্যবস্থা এতটাই নিম্নমানের যে, নারীরা রাস্তায় বের হলেই বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। যেমন- ইভটিজিং, রাস্তায় বিরক্তি করা, খারাপ ভাষায় গালি গালাজ করা ইত্যাদি।

০৯. মেয়েকে পরিবারে বোঝা মনে করা: আমাদের দেশের অনেক পরিবারের পিতামাতা মেয়েকে তাদের পরিবারে বোঝা মনে করেন। মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া যায় ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

## বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রভাব

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া এবং তার শরীর সন্তানধারণের উপযোগী হওয়ার আগেই তাকে গর্ভধারণ করতে হয়। অল্প বয়সে গর্ভধারণ করার ফলে গর্ভকালীন নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার অধিদপ্তরের তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি হাজারে ৩.২ জন হিসাবে লাখে ৩২০ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। প্রতিবছর ৫ লাখ ৫০ হাজার মা প্রসবকালীন অসুস্থতা ফিস্টুলা, জরায়ু বের হয়ে আসাসহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এসব জটিলতার কারণ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেডিকেল সায়েন্স অল্প বয়সে বিয়েকে দায়ী করছে।

অপরিণত বয়সে বিয়ে হলে কেবল যে মাতৃ ও শিশুর মৃত্যুহার বেড়ে যায় তা নয়, বেঁচে থাকা মা ও শিশু উভয়ই অপুষ্টির শিকার হয়। পুষ্টিবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক কাজী সালামত উল্লাহ বলেন, অপরিণত বয়সে মা হওয়া নারীরা বেশিরভাগই অপুষ্টির শিকার। ফলে তারা জন্ম দিচ্ছে অপুষ্ট শিশু। এ অপুষ্ট কন্যা শিশু একইভাবে আবার মা হচ্ছে। এভাবে একদিকে মায়ের গর্ভকালীন ঝুঁকি যেমন বেড়ে যাচ্ছে, অনুরূপভাবে জাতি হিসেবে আমরাও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছি।

## বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের প্রতিকারের উপায়

১. বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে স্কুলের শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রী ও স্কুল পরিচালনা কমিটিকে সচেতন করা, যাতে বাল্যবিবাহের ঘটনায় এরা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে।

২. স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য স্কুলের শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কাজীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩. সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন ও উদ্যোগী করে তোলা যাতে এলাকায় বাল্যবিবাহের বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪. বাল্যবিবাহের কারণে মা ও সন্তানের কী কী সমস্যা হতে পারে সে ব্যাপারে জনগণ ও অভিভাবকদের জানাতে স্থানীয় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৫. স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কেমন সে সম্পর্কে স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের মাঝে অনুসন্ধান চালানো এবং এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ করা। একইভাবে স্কুলগুলো যাতে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা।

## বাল্যবিবাহ

৬. 'বাল্যবিবাহকে না বলো' ইত্যাদি স্লোগানে সমৃদ্ধ কার্যক্রম স্কুলের কারিকলামে যুক্ত করা।
৭. বাল্যবিবাহের শিকার ছাত্রীদের যাতে পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৮. স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৯. বিবাহ নিবন্ধনের সময় কাজি যাতে বয়স সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় এবং কোনো কাজি যাতে বাল্যবিবাহ পড়াতে না পারেন সেজন্য জেলা রেজিস্টারির পক্ষ থেকে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা।
১০. কাজি, ঘটক, অভিভাবক সবাইকে কাউন্সিলিং করতে হবে।
১১. বাল্যবিবাহে জড়িত কাজি, ঘটক ও অভিভাবকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১২. বাল্যবিবাহে অংশগ্রহণ না করে তা বর্জনের জন্য সকলের সাথে প্রচার-প্রচারণা চালানো।
১৩. বিবাহ নিবন্ধনের সময় জন্মনিবন্ধন/স্কুল সনদ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা।
১৪. বাল্যবিবাহে বন্ধে যাতে কমিউনিটি ভূমিকা রাখতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৫. বাল্যবিবাহকারী এবং বাল্যবিবাহ আয়োজনকারীকে সামাজিকভাবে ভর্ৎসনা করা।

# বাংলাদেশে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যার ধারণা, কারণ প্রভাব এবং প্রতিকার



## কর্মজীবী নারীর সমস্যা

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মতো বাংলাদেশেরও মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে নারী সমাজের সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। বাংলাদেশের নারী সমাজ সে সহযোগিতা দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সমাজ অবহেলিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে নারীরা নানাভাবে সমস্যার শিকার হচ্ছে। যার ফলে নারীরা তাদের কর্মস্থলের ব্যাপারে হতাশা ও মানসিকভাবে সমস্যায় ভুগছে। কর্মজীবী নারীর এ সমস্যার কারণে পরিবার, সমাজ, দেশ, ভাষা, জাতি উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের নারীর একটি বৃহৎ অংশ কর্মজীবী। যেসব নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য নিজে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহসহ পরিবারকে সাপোর্ট দেয় তারাই কর্মজীবী নারী। কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

## কর্মজীবী নারীর সমস্যা

কর্মজীবী নারীর সমস্যার কারণ

১. আবাসন সমস্যা: কর্মজীবী নারীর প্রধান সমস্যা হলো আবাসন সমস্যা। কর্মজীবী নারীরা যে আবাসনের ব্যবস্থা পায় তা তাদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ নয়। পানি সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বাসস্থান সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত।

২. সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত: বাংলাদেশের অধিকাংশ কর্মজীবী নারী তাদের সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত হন। এর মধ্যে হলো যৌন নির্যাতন, অধিক কাজে বাধ্য করা, মানসিকভাবে চাপে রাখা ইত্যাদি।

৩. নিরাপত্তার অভাব: বাংলাদেশের কর্মজীবী নারীদের নিরাপত্তাজনিত সমস্যা বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মজীবী মহিলারা ব্যাপকহারে নিরাপত্তার অভাবে ভোগে। বিগত ২৪ মে ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে পড়ে। এতে ১১৩৪ জন মানুষ মারা যায়। যার অর্ধেকের বেশি নারী।

৪. নিয়োগকর্তা দ্বারা নির্যাতিত: বাংলাদেশের অধিকাংশ কর্মজীবী নারী তাদের নিয়োগকর্তার দ্বারা নির্যাতিত হন। এসব নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে যৌন নিপীড়নে বাধ্য করা।

৫. যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা আমাদের দেশে এমন কতিপয় স্বামী আছে যারা তাদের স্ত্রীকে যৌন ব্যবসায় বাধ্য করে। তা না হলে তাদের ওপর চলে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যা তাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলে।

## কর্মজীবী নারীর সমস্যা

কর্মজীবী নারীর সমস্যার প্রভাব

১. চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমাদের বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীদের সমস্যা নিত্যদিনের ব্যাপার। এ সমস্যার কারণে অনেক নারী তাদের চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এতে অনেক পরিবারে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়।

২. মানসিকভাবে হতাশ: বাংলাদেশের অনেক পরিবারের মেয়েরা শুধুমাত্র পেটের দায়ে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়। কিন্তু কর্মস্থলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে না পারে চাকরি ছেড়ে দিতে না পারে কাজ করতে। এ অবস্থায় তারা মানসিকভাবে হতাশায় ভোগে। যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

৩. যৌন ব্যবসায় বাধ্য হওয়া: আমাদের সমাজে এমন স্বামী আছে যারা তাদের স্ত্রীদেরকে যৌন ব্যবসায় বাধ্য করে। তা না হলে তাদের ওপর চলে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বাধ্য হয়েই স্ত্রীরা যৌন ব্যবসায় নেমে পড়ে।

৪. নারী পাচার: আমাদের সমাজে এমন অনেক দালাল আছে যারা নারীদেরকে অনেক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের নামে পাচার করে। তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। যা আমাদের নারী জাতির জন্য হতাশাজনক।

৫. বেতন বৈষম্য আমাদের দেশের অধিকাংশ কর্মজীবী নারী তাদের যথোপযুক্ত বেতনভাতা পায় না। যদিও তারা পুরুষের সমান কাজ করে, তথাপি তাদেরকে যথাযথ বেতনভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। L

## কর্মজীবী নারীর সমস্যা

কর্মজীবী নারীর সমস্যার প্রতিকারের উপায়

১. আবাসন ব্যবস্থার প্রসারণ: বাংলাদেশের নারীর সমস্যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আবাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে হবে। যাতে নারীরা যথাযথ সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে।

২. সামাজিকভাবে সচেতনতা: কর্মজীবী নারীর সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিকভাবে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

৩. আইন প্রণয়ন: কর্মজীবী নারীর সমস্যা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। আর সমস্যা সৃষ্টিকারীকে যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।

৪. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা: বাংলাদেশের নারী জাতির উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন দিতে হবে। যাতে তারা বিভিন্ন কর্মস্থলে সমস্যায় না পড়ে।

## কর্মজীবী নারীর সমস্যা

৫. বেতন বৈষম্যরোধ করতে হবে: কর্মজীবী নারীর একটি অন্যতম সমস্যা হলো বেতন বৈষম্য। তাই বেতন বৈষম্য যত দ্রুত সম্ভব দূর করতে হবে। আর এতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

৬. কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে: কর্মজীবী নারীরা যাতে তাদের সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৭. পারিবারিকভাবে সাহায্য করা: যেহেতু অধিকাংশ পরিবারের নারীই একমাত্র উপার্জনকারী তাই পরিবারের অন্য সদস্যদের উচিত তাদেরকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করা।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে প্রায় অর্ধেকই নারীর অবদান। তাই কর্মজীবী নারীদেরকে কোনোভাবেই হেয় করে দেখা উচিত নয়। বরং সকলের উচিত নারী-পুরুষ সহমর্মিতায় কাজ করা যাতে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ঘটে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৭ বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব

## This Topic is important for

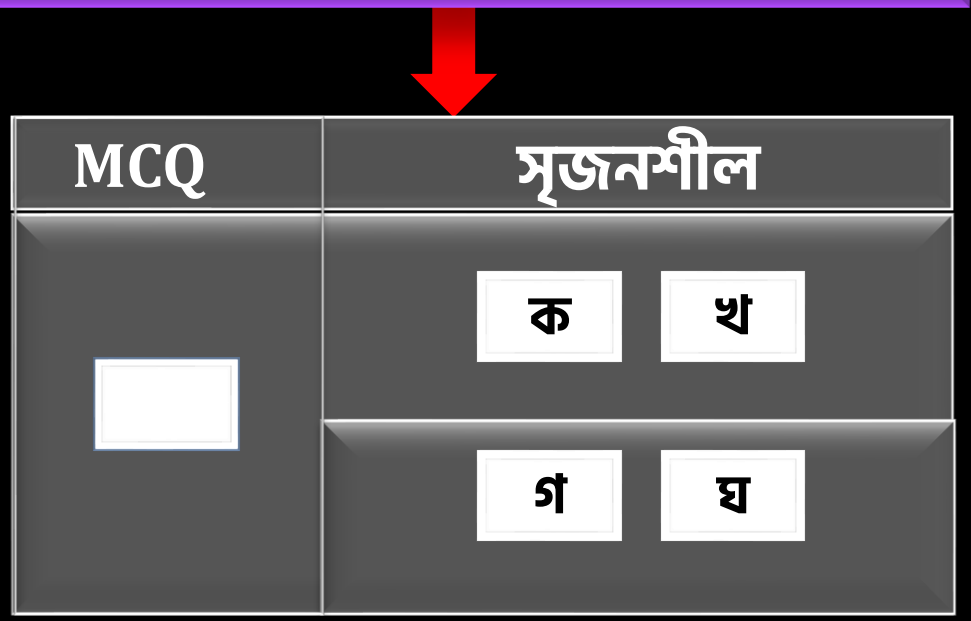

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## বাংলাদেশের প্রবীণ সমস্যার কারণ

প্রবীণত্ব হলো মানবজীবনের ধারাবাহিক শারীরিক ও মানুসিক পরিবর্তনের চূড়ান্ত পর্ব। মানুষ জন্মের পর ০-৫ শৈশব, ১৭-১৯ কৈশোর, ২০-৪০ যৌবন, ৪০-৬০ বার্ধক্য, ৬০-৯০ প্রৌঢ়ত্ব, ৯০+ জড়ত্ব ইত্যাদি স্তর পার হয়ে জীবনের শেষের দিকে এগিয়ে যায়। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ। বার্ধক্য এমন একটি পর্যায়, যখন মানুষের সার্বিক উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। এজন্য একে দ্বিতীয় শৈশবও বলা হয়। বয়সের নিরিখে বার্ধক্য নিরূপিত হলেও কত বছর বয়সে পৌঁছালে একজন মানুষ প্রবীণ হয়, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। অনেকে অবসর গ্রহণের সময়কে বার্ধক্যের মাপকাঠি বলত চান। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারি চাকরির অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে বাড়িয়ে ৫৯ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বেশকিছু পদে অবসরের বয়স ৬৫ বছর, জাতিসংঘের হিসাবে তা ৬৫ বছর। আবার বেশকিছু বেসরকারি ও স্বকর্মসংস্থানমূলক পেশার অবসরের কোনো বয়সসীমা নেই। তাই এটি আদর্শ মানদণ্ড হতে পারে না।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## বাংলাদেশের প্রবীণ সমস্যার কারণ

তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রচলিত কথা হলো ০-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু, ১৫-৫৯ বছর পর্যন্ত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এবং ৬০+ বয়স ব্যক্তিরা প্রবীণ। যদিও এতে বিতর্ক আছে। সাধারণভাবে ৬০ ঊর্ধ্ব বছর বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে প্রবীণ নাগরিক বলা হয়। এর মধ্যে আবার ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক বৃদ্ধ বয়স, ৭০-৯০ বছর পর্যন্ত মধ্য বৃদ্ধ বয়স এবং ৯০ বছরও এর ঊর্ধ্বে বেশি বৃদ্ধ বয়স বলা হয়। সার্বজনীন এ বয়স্ক বা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যে সমস্যা, তাই বাংলাদেশের প্রবীণ বা বার্ধক্য সমস্যা নামে পরিচিত।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## বাংলাদেশের প্রবীণ সমস্যার কারণ

বার্ধক্য হলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলগত উদ্ভাবনজাত বা উন্নয়নপ্রসূত একটি সমস্যা। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নত, চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং আধুনিক জীবনযাত্রা ও শহুরে বাস্তবতার কারণে দিনে দিনে এ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বাড়ার সাথে সাথে প্রবীণদের সংখ্যাও বেড়েছে। আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রবীণ সমস্যা।

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে একসময় প্রবীণ ব্যক্তিরা ছিল সবার শ্রদ্ধার পাত্র। যৌথ পরিবার প্রথায় পরিবারের কর্তার ভূমিকায় থাকতেন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু বর্তমান পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে একক পরিবারের রূপ নিয়েছে। পেশাগত তাগিদে নবীনেরা শহরে নতুন পরিবার নিয়ে থাকছে। ফলে বৃদ্ধ মা-বাবারা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পেশার ক্ষেত্রে নতুনত্ব আসছে। এসব কারণে বার্ধক্য সমস্যা বাড়ছে।

মানুষের মধ্যে যথাযথ নৈতিক শিক্ষার অভাব আমাদের সমাজে প্রকট আকার ধারণ করছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করার মতো শিক্ষা পরিবার থেকে খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলো প্রবীণদের অধিকার বিষয়ে তেমন সোচ্চার নয়। তাই প্রবীণদের নিয়ে মাথাব্যথা যেন কারও মধ্যেই দেখা যাচ্ছে না। এরূপ পরিবেশে প্রবীণ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## বাংলাদেশের প্রবীণ সমস্যার কারণ

বেকারত্বজনিত কারণে সৃষ্ট দারিদ্র্য সমস্যা বাংলাদেশের সমাজে একটা বড় সমস্যা। দরিদ্র পরিবারের বেকারত্বের জন্য পরিবারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই এসব পরিবারে অপূর্ণতা দেখা যায়। এরূপ পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে বোঝা হিসেবে মনে করে থাকে কেউ কেউ। আবার পরিবারের আয় বৃদ্ধির তাগিদে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কাজ করতে হয়। প্রবীণরা স্বভাবতই অপরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যে পরিবারে কর্মজীবী, সেখানে প্রবীণদের দেখাশুনা করার মতো কেউ থাকে না। ব্যস্ততার জন্য প্রবীণদের সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। এসব কারণে অবহেলার শিকার হন।

বাংলাদেশে প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। একজন মানুষ সারাজীবন তার মেধা, শ্রম, চেষ্টা দিয়ে সমাজের জন্য কাজ করেন। অথচ বৃদ্ধ বয়সে সমাজ তাকে বোঝা মনে করে। বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরের বাইরে প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত কোনো হাসপাতাল নেই। যেগুলো আছে তাতেও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। প্রবীণদের জন্য তাদের উপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা নেই। এসব কারণে বাংলাদেশের প্রবীণদেরকে সমস্যার মধ্যেই থাকতে হয়।

## বাংলাদেশে প্রবীণ সমস্যার প্রভাব

এদেশের অন্যান্য সমস্যার মতো প্রবীণদের সমস্যাও ধীরে ধীরে প্রকট আকার ধারণ করছে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, অভাব-অনটনের জীবন, জীবনযাত্রার নিম্নমান, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি কারণে প্রবীণরা যেন আজ আমাদের সমাজের কর্মক্ষম লোকদের নিকট বোঝায় পরিণতি হয়েছে। চিন্তাচেতনা বোধ, বিশ্রাম, জ্ঞানের ক্ষেত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে নবীন প্রবীণ সংঘাত, মতপার্থক্য যেন এ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের জন্য নেই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদনের সুবিধা। তাই প্রবীণরা আজ স্বাস্থ্য, আর্থসামাজিক, মনোদৈহিক নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমান সময় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে। এরূপ পরিবার ব্যবস্থা প্রবীণদেরকে একাকিত্বে ফেলে দিয়েছে। ছেলেমেয়ে আলাদা পরিবার গঠন করে শহরে থাকছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কর্মজীবী হওয়াতে বৃদ্ধদেরকে দেখাশুনা করার মতো কেউ থাকছে না। আবার অতি আধুনিকতার নামে অনেক পরিবারে প্রবীণরা সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এরূপ ব্যক্তিদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হওয়ার ফলে এসব পরিবারে প্রবীণরা যথাযথ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## বাংলাদেশে প্রবীণ সমস্যার প্রভাব

বাংলাদেশে প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত পর্যাপ্ত হাসপাতাল নেই। নেই কোনোরূপ বিনোদনের ব্যবস্থা। তাই প্রবীণদের সময় কাটে অত্যন্ত কষ্টের সাথে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার ফলে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। প্রবীণদের জন্য এসময় কোনো কাজ করাও সম্ভব হয় না। তাই কাজহীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপনই যেন তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। বার্ধক্যের সময় স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ, জ্বরাব্যাধি, অসুস্থতা, দুর্বলতা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যায় কাটাতে হয়। প্রবীণরা অন্যের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিন্তু এ নির্ভরশীলতার সময় অনেক পরিবারেই প্রবীণরা পর্যাপ্ত সহায়তা পান না। এসময় তাদের শারীরিক, মানসিক সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত যত্নেরও দরকার হয়। কিন্তু সব প্রবীণের ভাগ্যে এতটুকু জোটে না।

সুতরাং প্রবীণরা আর্থসামাজিক মনোদৈহিক নানাবিধ সমস্যায় পতিত হন। অনেক সময় তাদের সমস্যা শেয়ার করার মতো কেউ থাকে না। প্রবীণদের সমস্যার কারণে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## প্রবীণ সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রবীণদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা ও করুণ অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য এখনই আমাদের জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, এখন যাদের হাতে এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের দায়িত্ব, একদিন তারাও প্রবীণদের কাতারে চলে যাবেন। তাই নিজের স্বার্থেই প্রয়োজনে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশে বৃদ্ধ তথা প্রবীণদের জন্য প্রথমে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা দরকার। এজন্য প্রবীণের সংজ্ঞায়ন জরুরি। ৬০ বছর ও তদূর্ধ্বদেরকে প্রবীণ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। তাদের যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। তাদেরকে জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁদের বিজ্ঞোচিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের পরামর্শ চাওয়া যেতে পারে। তাঁদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিনোদন, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড করার সুযোগ যাতে তারা সহজেই করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রবীণ কল্যাণে পৃথক অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয় গঠন করা যেতে পারে।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## প্রবীণ সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রবীণরা যাতে পরিবারে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বসবাস করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক/ব্যক্তিগত সচেতনতা। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি সন্তানকে মনে রাখতে হবে, তারাও এক সময় বৃদ্ধ হবেন। সুতরাং তারা যদি আজ প্রবীণদেরকে অবহেলা করেন, তাদের সন্তানেরা তা দেখে তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। সুতরাং নিজে বৃদ্ধ হয়ে যেরূপ আচার-ব্যবহার পরিবার থেকে প্রত্যাশা করেন, বৃদ্ধ মা-বাবার সাথে যেন সেরূপ ব্যবহার নিজ দায়িত্বে করেন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কেননা ইসলাম ধর্মে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালনে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও এরূপ নির্দেশ আছে। এজন্য ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুশীলন করতে হবে। বাংলাদেশের প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই পরিবারে নিগৃহ হন। যথাযথ মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারেন না। প্রয়োজনে এরূপ সন্তানকে বাধ্য করতে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রয়োজন। যারা প্রবীণদের সাথে এরূপ আচরণ করে, তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে 'বৃদ্ধাশ্রম' গড়ে পরিবারের বাইরে থাকা এরূপ প্রবীণদের পুনর্বাসন করা যায়। প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি বাড়াতে হবে একই সাথে।

# বাংলাদেশের বার্ধক্য সমস্যার ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## প্রবীণ সমস্যা সমাধানের উপায়

আমাদের মনে রাখা উচিত, প্রকৃতির অমোঘ সত্য নিয়মে আমরা সবাই একদিন (বেঁচে থাকলে) প্রবীণ নাগরিকদের কাতারে চলে যাব। আমরা যারা এখন কর্মক্ষম, সমর্থবান, তারা যদি প্রবীণদেরকে যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা না দিই, তবে আমাদের বৃদ্ধ বয়সে অন্যরা আমাদের এরূপ সুবিধা ও মর্যাদা দেবে না। তাই নিজেদের স্বার্থে গভীর মমতা ও ভালোবাসায়, নিজেদের সাধ্য অনুসারে প্রবীণদের আগলে রাখতে হবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা কিংবা দাদা-দাদির সর্বাত্মক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। প্রবীণ বয়সে কোনো ব্যক্তির নিবাস যেন বৃদ্ধাশ্রম না হয়, সেটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৮ বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



জঙ্গি শব্দটি ইংরেজি 'Militant' এবং ল্যাটিন শব্দ 'মিলিট্যার' (Militare) থেকে এসেছে। 'মিলিট্যার' শব্দের অর্থ হলো সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিকোণ থেকে জঙ্গি বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত সংস্কারের সমার্থনে সমবেতভাবে কাজ করে। জঙ্গিরা চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয়। জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের একটি আধুনিক সামাজিক সমস্যা। জঙ্গিরা পবিত্র ধর্ম ইসলামের নাম করে অনৈসলামিক কার্যকলাপ, অশান্তি সৃষ্টি করে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করে। অথচ ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। সব ধরনের অন্যায় অবিচার, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। কিন্তু জঙ্গিরা ধর্মের নাম করে সেই নিষিদ্ধ কাজটিই করে বা করার চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে নিজেরাও সমাজের চোখে ঘৃণিত হয়। সমাজকেও ঘৃণিত করে।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



জঙ্গিবাদ

বর্তমান সময়ে জঙ্গিবাদ খুবই পরিচিত একটি শব্দ। এটি মূলত সন্ত্রাসবাদের সমর্থক। সন্ত্রাসবাদ পৃথিবীতে কোনো নতুন বিষয় নয়। কিন্তু জঙ্গিবাদের ধারণাটি মূলত আধুনিককালের। বিশেষত মুসলিম ও মুসলমানদের সাথে এর সম্পৃক্ততা ঘিরে, খুব সুনির্দিষ্ট করে বললে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের অপপ্রচার, তাদের মদদপুষ্ট মিডিয়ার অব্যাহত প্রচার একে নতুন মাত্রা দিয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, স্বাধিকার আন্দোলন, দমন-পীড়ন, বর্ণবাদ ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠী প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য গালি হিসেবেও সন্ত্রাসী আখ্যা দিতে পারে। যেমন- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারী নেতাদেরকে ইংরেজরা সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এদিক থেকে সন্ত্রাসবাদ ঐতিহাসিক কালের। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল সন্ত্রাসবাদী। আধুনিক সন্ত্রাসবাদ ইহুদিদের সৃষ্টি।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ

সন্ত্রাসবাদ যখন জঙ্গিবাদ নামধারণ করে তখন যেন তা আবশ্যিকভাবে মুসলমানদের ওপরই এসে পড়ে। বিশেষত বর্তমান পশ্চিমা গণমাধ্যমের একতরফা প্রচার, ইসলামপন্থি (যদিও অনেকের সন্দেহ আছে) বিভিন্ন সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ইত্যাদির কারণে যেন মুসলমান ও জঙ্গিবাদ সমর্থক হয়ে উঠেছে। আল-কায়েদার মতো সংগঠনের বিতর্কিত কার্যকলাপ যেন একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের উদ্ভব এবং এসব সংগঠনের কার্যকলাপও এ ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে।

বর্তমানকালে জঙ্গিবাদ নিয়ে যার মাথাব্যথা সবচেয়ে বেশি, সেই যুক্তরাষ্ট্রই জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক ও জন্মদাতা। কিন্তু আজ তা বুমেরাং হয়ে যুক্তরাষ্ট্রেরই গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করে নিলে আফগানদের মাঝে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র তার চিরশত্রু রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে আফগানিস্তানে গড়ে তোলে তালেবান বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদ ও সহযোগিতায় তালেবান যোদ্ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে। ভেঙে যায় সোভিয়েত রাশিয়া। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্থিতিশীল বিশ্বে অস্ত্র ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে দরকার হয় নতুন শত্রু। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল হ্যান্টিংটনের 'সভ্যতার সংকট' নামক তত্ত্বে নতুন শত্রু হিসেবে মুসলমানদেরকে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু মুসলমানরা না ছিল সংগঠিত, না তাদের ছিল সেরূপ কোনো সামর্থ্য। যে কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে অপপ্রচার চালানো হয় যে, এরা ভয়ঙ্কর জাতি, মুসলমানদের হাতে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। যেমনটি বলা হয়েছিল, ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণের সময়, যা পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরূপ অপপ্রচার, ফিলিস্তিন মুসলমানদের ওপর অব্যাহত নির্যাতন, মুসলিম দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠীর শর্তহীন মার্কিন আনুগত্য, মুসলিম দেশসমূহের পারস্পরিক আস্থাহীনতা ইত্যাদি কারণে জঙ্গিবাদ শব্দটি মুসলমানদের ওপর এঁটে দেওয়া হয়। অথচ ইসরাইল যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের হত্যা করে চললেও তাকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বসনিয়ায় নির্বিচারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালালেও তাকে জঙ্গিবাদ বলা হয় না।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



## বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের ধারণা

বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই শান্তিকামী। এদেশের মানুষের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ পৌছেছে মূলত সুফি-দরবেশদের মাধ্যমে, যাঁরা ছিলেন পরমতসহিষ্ণু। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান গোপনে ঘটে ১৯৮০-এর দশকে। কিন্তু প্রকাশ্যে আসে ১৯৯০-এর শেষের দিকে। মূলত সোভিয়েতবিরোধী আফগানদের সমর্থনেই এদেশে জঙ্গিবাদ সংগঠিত হয়। অন্যান্য দেশের জঙ্গিবাদ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। সাধারণভাবে এরা সংগঠিত হয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে।

'জামায়াতুল মুজাহিদিন' বা জেএমবি নামক জঙ্গি সংগঠনটি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে প্রকাশ্যে আসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে। শায়খ আবদুর রহমান, বাংলা ভাইসহ শীর্ষস্থানীয় জঙ্গিরা মূলত ইসলামের সুমহান বাণীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এরূপ কার্যকলাপ পরিচালনা করতে থাকে। যদিও বড় কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততার কথাও এতে শোনা যায়। এছাড়া আল্লাহর দল, হিজবুত তাহরীর, জাগ্রত মুসলিম পার্টি, হরকাতুল জিহাদ, হিজবুল্লাহ শাহাদত-আল-হিকমা, জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশসহ আরও বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠন বাংলাদেশে ধরা পড়ে।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কারণ

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে মূলত আন্তর্জাতিকভাবে সৃষ্ট জঙ্গিবাদের আদলে। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও এখানে এমন সব প্রভাবক কাজ করেছে, তা বাংলাদেশের সাথে মানায় না। যেমন-আফগানিস্তানে স্বাধীনতাকামীদের দিয়ে জঙ্গিবাদ শুরু হলেও বাংলাদেশে তা শুরু হয় ভিন্ন মতাবলম্বীদের দিয়ে। বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের পেছনে যেসব কারণকে দায়ী করা হয় তার মধ্যে প্রধান হলো-

১. নিরক্ষরতা ও কুশিক্ষা: বাংলাদেশে ধরা পড়া জঙ্গিদের একটি বড় অংশ ছিল শিক্ষার আলো বঞ্চিত। এদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জঙ্গিবাদী নেতারা ইসলামের জিহাদ সম্পর্কিত শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে জঙ্গিবাদের দিকে আকৃষ্ট করে।

২. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব: কর্মহীন বেকার জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে জঙ্গিবাদী দলের অন্তর্ভুক্ত করে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে।

৩. ধর্ম ভীরু: বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবতই ধার্মিক ও ধর্মভীরু। এ সুযোগ নিয়ে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ধর্মের বিধানের অপব্যাখ্যা দিয়ে সহজেই ভুলিয়ে মানুষকে বিপথগামী করে ফেলে।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



৪. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: বিশ্বায়নের এ যুগে এক দেশের কার্যকলাপ অন্যান্য দেশকে খুব সহজেই প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের জঙ্গিবাদের প্রভাবেও এদেশে জঙ্গিবাদ বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এদেশের জঙ্গিদের সাথে অন্যান্য দেশের জঙ্গিদের যোগাযোগেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৫. আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র: পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই)-এর মদদে বাংলাদেশ এবং ভারতে জঙ্গি সংগঠনগুলো সংগঠিত হয় বলে জানা যায়। এছাড়া ভারতের 'র' এবং ইসরাইলের 'মোসাদ'ও অনুরূপ কাজের সাথে জড়িত বলে অনেকে মনে করেন।

৬. ইসলামবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপ: বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু হওয়ার কারণে কেউ ইসলাম, মুসলমান নিয়ে কটূক্তি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলে তা তাদের আবেগে আঘাত হানে। জঙ্গিরা এ সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে তাদের দলে ভেড়ায়।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



৭. প্রতিবেশী দেশের ভূমিকা: ভারতে ১৯৯০ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নির্যাতন, এদেশের চিরাচরিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার ওপর আঘাত হানে। ধর্মপ্রাণ এবং আবেগময় মুসলমানরা এ বিষয়গুলোকে সহজভাবে নিতে পারে না। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের প্রথম প্রকাশ্য কার্যক্রম দেখা দিয়েছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও অযোদ্ধায় মুসলিম হত্যাযজ্ঞের পর।

৮. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা: বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার এক বড় অংশের ওপর সরকারের কোনো নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ নেই। এরূপ মাদ্রাসার কোনো কোনোটিতে জঙ্গিবাদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ আছে। তবে এ সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থী হয় সাধারণত নিম্নবিত্ত, অসহায়, এতিম পরিবারের সন্তানরা। এদেরকে খুব সহজেই জঙ্গিবাদের দিকে প্রলুব্ধ করা যায়। এসব মাদ্রাসায় ইসলামি শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয় বলে অভিযোগ আছে।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



জঙ্গিবাদ সমস্যার প্রভাব

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে জঙ্গিবাদ সমস্যার প্রভাব ভয়াবহ, মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। জঙ্গিরা জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ তেমনি একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও ব্যাহত হতে পারে জঙ্গি তৎপরতার কারণে। নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে এরা সমাজে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষ নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে ভয় পায়। এরূপ পরিবেশ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতির বড় অন্তরায়।

জঙ্গিবাদের উদ্ভবের সাথে দেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে দেশকে ইমেজ সংকটে পড়তে হয়। যে কারণে বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, বিনিয়োগ কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পর্যটন শিল্প দারুণভাবে মার খায়। দেশের শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া দেশ থেকে বিভিন্ন কারণে যারা বিদেশ যান, তাদেরকে হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিদের নেতিবাচকভাবে দেখতে থাকে সেসব দেশের সরকার ও জনগণ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অযথা এসব দেশের নাগরিকদের সন্দেহের চোখে দেখে থাকে।

জঙ্গিবাদ সমস্যা দেশ ও সমাজের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নকে ব্যাহত করে। সামাজিক সমস্যা হিসেবে জঙ্গিবাদ সমাজকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



জঙ্গিবাদ সমস্যা সমাধানের উপায়

জঙ্গিবাদ সমস্যা সমাজ থেকে মূলোৎপাটন করা সময়ের দাবি। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ এবং সরকারের সদিচ্ছা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বিত পদক্ষেপে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব। যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে সমাজের ধর্মান্ধ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা দলের সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং সেই ধারার/ইসলামি ভাবাদর্শনের অধিকাংশ মানুষ এদের সাথে একমত নয়। জঙ্গিরা সমাজের স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর লোকদেরকে ইসলামের সুমহান বাণীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে জঙ্গি বানায়- এরূপ অভিযোগ প্রায়ই পাওয়া যায়। এজন্য মসজিদের ইমাম, আলেম সমাজ এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা ও বিধান তুলে ধরা।

ইসলামে 'অশান্তি সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও জঘন্য' বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু জঙ্গিরা এসব বিধিবিধানকে উল্টোভাবে উপস্থাপন করে। মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে এক মুসলমানের জীবন ও সম্পদকে অন্যের 'আমানত' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু জঙ্গিরা নামাজরত মুসলমানদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে ইসলাম কায়েম (1) করতে চায়। এদের অনুসৃত ইসলামি আদর্শ ও চিন্তাধারা মৌলিকভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়সমূহ সাধারণ মুসলমানদের বোঝানোর দায়িত্ব মসজিদের ইমাম, আলেম সমাজ ও সরকারের।

# বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের ধারণা, কারণ ও প্রভাব



নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের ভারে ন্যুজ যুবক শ্রেণি খুব সহজেই জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরূপ দেখা গেছে বিভিন্ন ঘটনায়। আবার কিছু কিছু মাদ্রাসাও জঙ্গিবাদের ঘাঁটি হিসেবে কাজ করে।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার কারণেও এরূপ হয় বলে সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা। তাই শিক্ষা বিস্তার এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। সবধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনীকে দক্ষতার সাথে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। জনগণকে সম্পৃক্ত করে জঙ্গিবাদবিরোধী অভিযানকে জোরদার করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গিবাদকে নির্মূল করতে হবে।

জনসাধারণকে জঙ্গিবাদের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে অবগত করতে হবে। জঙ্গিবাদকে সামাজিকভাবে বয়কট করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গণমাধ্যমকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জঙ্গিবাদকে দমন করতে হবে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জঙ্গিবাদকে দমন করার চেষ্টা করা হলে তা জঙ্গিবাদকে আরও উস্কে দেয়। এজন্য সামাজিকভাবে জঙ্গিবাদের উৎসকে বন্ধ করতে হবে। জঙ্গিবাদকে দমন নয়, এর উৎসমূলকে দমন করতে হবে।

সর্বোপরি সুস্থ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন জঙ্গি সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার ভাব

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার

## This Topic is important for

| MCQ | সৃজনশীল |
| --- | --- |
| | ক খ |
| | গ ঘ |

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের উচ্চ জনসংখ্যা প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করেছে অতিরিক্ত চাপ। ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। পানি, মাটি, বায়ু, শব্দ, তেজস্ক্রিয়তা দূষণের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, জ্বালানি তেলের অতিরিক্ত ব্যবহার, যানবাহন ও কলকারখানায় নির্গত ধোঁয়া, ইট ভাটার ধোঁয়া ইত্যাদি আমাদের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। ফলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে অন্যতম বড় প্রভাবক বলে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ দূষণের ফলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এর সবগুলো সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, বায়ু দূষণ, সমুদ্র দূষণ ইত্যাদির জন্য বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে দায়ী নয়। কিন্তু এর থেকে উদ্ভূত ক্ষতির শিকার দেশগুলোর অন্যতম হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## বায়ু দূষণ

মানুষ তথা জীবজগতের জন্য আবশ্যক উপাদান হলো বাতাস। বিশুদ্ধ বাতাস আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য আবশ্যক। এটি ছাড়া কয়েক মিনিট সময়ও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। জীবনের জন্য অপরিহার্য এ উপাদান বাতাসে থাকে পরিমিত মাত্রার বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান। কিন্তু যদি এ উপাদানগুলোর ভারসাম্যহীনতার কারণে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে দূষিত বায়ু বলে। প্রাকতিকভাবে অথবা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর ও বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের দুষণ ঘটে থাকে। বায়ুদূষণপূর্ণ কোনো একটি এলাকার বায়ুতে অবমুক্ত ক্ষতিকর পদার্থসমূহের পরিমাণ অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিকতর হওয়ায় সহজেই দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ শনাক্ত করা যায়। বায়ুদূষণের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া, বিদ্যুত ও তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্র থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া, শিল্পকারখানা এবং কঠিন বর্জ্য পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া। এছাড়াও বায়ু দূষিত হয় নানাবিধ কারণে।

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হলো দূষিত বাতাস তথা বায়ু দূষণ। বাতাসে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, সীসা, সালফার ডাইঅক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি মিশে বাতাসকে দূষিত করে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিশেষত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বায়ু দূষণের চরম পর্যায়ে পৌছেছে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণের কারণ

বাংলাদেশে বায়ু দূষণের প্রধান কারণগুলো হলো-

# অতিরিক্ত জনসংখ্যা

# নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন

# অতিরিক্ত যানবাহন

# ত্রুটিযুক্ত যানবাহন ও কলকারখানা

# ইট ভাটায় নির্বিচারে কাঠ পোড়ানো

# অপরিকল্পিত নগরায়ণ

# গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে কাঠ-খড় পোড়ানো

# প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ না করা ইত্যাদি।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণের প্রভাব বায়ু দূষণের কারণে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দু ধরনের প্রভাব দেখা যায়। এসব সমস্যা মূলত স্বাস্থ্যগত সমস্যা।

স্বল্পকালীন সমস্যা: বায়ু দূষণের কারণে স্বল্পকালীন সময়ে চোখ ও নাকে ব্যথা হয়। এছাড়া ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ার মতো মারাত্মক রোগও হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা: এজন্য দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, ফুসফুস ক্যান্সার, হার্টের সমস্যা, এমনকি ব্রেইন, নার্ভসিস্টেম, লিভার ও কিডনি সমস্যাও হতে পারে।

বায়ু দূষণের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত থাকতে পারে না, চাইলেও সম্ভব নয়। তবে শিশুরা এ থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## বায়ু দূষণ

বায়ু দূষণ রোধে করণীয়

# বায়ু দূষণের মতো সমস্যা থেকে মুক্তি চাইলে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার।

# বেশি পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে।

# ত্রুটিপূর্ণ, কালো ধোঁয়া উদ্‌দগীরণকারী যানবাহন নিষিদ্ধ করতে হবে।

# কলকারখানার ধোঁয়া যাতে পরিবেশ দূষণ না করতে পারে সেজন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

# উন্নত চুলা ব্যবহার করতে হবে।

# ইট ভাটার পরিবেশ দূষণকারী ৬০ ফুটের কম উচ্চতার চিমনি ব্যবহার করতে হবে। কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে হবে।

# কীটনাশকের অবাঞ্ছিত ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

# অ্যারোসলে ক্ষতিকর সিএফসির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## শব্দ দূষণ

আমাদের জীবনে শব্দের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার অপরিহার্য। শ্রুতিমধুর, সুন্দর সুর আমাদের মনে প্রশান্তি আনে। শব্দ ব্যতীত যোগাযোগ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এ শব্দ যখন সহনীয় মাত্রার চেয়ে তীব্র হয়ে আমাদের বিরক্তির সৃষ্টি করে এবং ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে, তখন তাকে শব্দ দূষণ বলে। শব্দ দূষণ চরম বিরক্তিকর, জনজীবনের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ। শব্দ দূষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভারতের প্রখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী N. Manivasa Kam বলেন, "স্বাভাবিক পরিবেশে সহ্য ক্ষমতার বাইরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ তীব্রতার শব্দ, যা জীবজগতের বিশেষত মানুষের অপ্রতিরোধ্য ক্ষতির কারণ, তাই হলো শব্দ দূষণ।"

বাংলাদেশে শব্দ দূষণ একটি মারাত্মক সমস্যা। বাস-ট্রাক, টেম্পো ইত্যাদির ইঞ্জিনের শব্দ, হাইড্রোলিক হর্ন, বজ্রপাত, পটকাবাজি, জেনারেটর, মিছিল-মিটিং, লাউড স্পিকার, বিমানের ইঞ্জিন, নির্মাণকাজ, রেলের হর্ন ইত্যাদি শব্দ দূষণের কারণ। শব্দ দূষণ সহ্যের সীমা অতিক্রম চলে গেছে।

## শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণের কারণ

যেসব শব্দ দূষণের কারণ, তা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু কারণ শব্দ দূষণের জন্য দায়ী। যেমন-

# হকারদের মাইকের আওয়াজ।
# ঝগড়া-বিবাদ।
# কলকারখানার শব্দ।
# মেলা বা হাটবাজারের মাইক।
# হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিডির দোকানে মাইকে গান বাজানোর শব্দ।
# রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং।
# রেডিও টিভির শব্দ।
# অপ্রয়োজনে উৎপাদিত শব্দ।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণের প্রভাব

মানুষের শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল (db)। সর্বোচ্চ ৭০ ডেসিবেল পর্যন্ত মানুষ সহ্য করতে পারে। ১০৫ ডেসিবেলে মানুষ বধির হয়ে যেতে পারে। শব্দ দূষণ মানুষের শ্রবণশক্তির ক্ষতি করা ছাড়াও নানাবিধ ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে প্রধান হলো-

# শব্দ দূষণ হৃদরোগের কারণ।

# এটি মানুষের উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

# মনোযোগের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

# মানুষের মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়।

# হঠাৎ উচ্চ শব্দ মানুষের ধমনিকে সংকুচিত করে দেয়, হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহে বাধার সৃষ্টি করে, যা থেকে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

# উচ্চ শব্দ মানুষের হজমে সমস্যা ও পেপটিক আলসার সৃষ্টি করে।

# শব্দ দূষণের শিকার গর্ভবতী নারীরা বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন।

# দীর্ঘদিন উচ্চ শব্দে থাকলে যে কেউ বধির হয়ে যেতে পারেন।

# শিশুদের মানসিক বিকাশকে ব্যাহত করে শব্দ দূষণ।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## পানি দূষণ

পানি দূষণের কারণ

আমরা পানিকে নানাভাবে দূষিত করছি। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নদীনালা, খালবিল দিয়ে চলে। এ প্রবাহ পথের যেকোনো পর্যায়ে পানি দূষিত হতে পারে। ময়লা-আবর্জনা বা অন্যান্য উপাদান পানিকে দূষিত করে। পানি দূষণের প্রধান এবং বৃহত্তম কারণ হলো কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ। কলকারখানায় ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ শোধন না করে পানিতে নিক্ষেপের ফলে পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীর চিত্র দেখলে এটি সহজেই বোঝা যায়। এসব নদীর পানি এতই দূষিত যে, এতে কোনো জলজ প্রাণী পর্যন্ত নেই। এছাড়া-

- জমিতে কীটনাশক ও সার প্রয়োগের ফলে পানি দূষিত হচ্ছে।
- গৃহস্থালি ও পয়ঃবর্জ্য পদার্থ পানিতে নিক্ষেপের ফলে পানি দূষিত হচ্ছে।
- সামুদ্রিক নৌযান, জাহাজ, বড় বড় নৌকা পানিতে তেল নিঃসরণ করে পানিকে দূষিত করে।
- প্লাস্টিক জাতীয় অপচনশীল বস্তুও পানিকে দূষিত করে।
- পানিতে বিভিন্ন প্রাণী মরে পচে গেলে পানি দূষিত হয়।
- আর্সেনিক দূষণ বর্তমান সময়ে পানি দূষণের ক্ষেত্রে এক আতঙ্কের নাম। আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢেলে পড়ে। আর্সেনিক দূষণ বর্তমানে পানি দূষণের ক্ষেত্রে এক বড় সমস্যা।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## পানি দূষণ

পানি দূষণের প্রভাব

পানি দূষণ মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। দূষিত পানি পান করলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এর ক্ষতিকর কয়েকটি দিক হলো-

# পানি দূষণ প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে।

# ইকো-সিস্টেমকে ভারসাম্যহীন করে দেয়।

# জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়।

# মাছের উৎপাদন কমে যায়। ফলে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

# মাটি দূষণ ঘটায়।

# দূষিত পানি পানের মাধ্যমে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগব্যাধি যেমন- ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

# পানি দূষণ কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

# পানিবাহিত রোগে প্রতিদিন বিশ্বে ৪,৫০০ শিশু মারা যায়।

# আর্সেনিক দূষণ মানবজাতির জন্য হুমকি তৈরি করেছে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## পানি দূষণ

পানি দূষণ প্রতিরোধে করণীয়

আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পানি দূষণ প্রতিরোধ করতে হবে। এজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে-

# শিল্পবর্জ্য যাতে পানিতে না ফেলা হয়, তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি শিল্পকারখানায় বাধ্যতামূলকভাবে EPT বসাতে হবে।

# পানি নীতি ও পানিসম্পদ রক্ষায় কঠোর আইন করে তা প্রয়োগ করতে হবে।

# রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক যাতে কৃষি জমি থেকে পানিকে দূষিত না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

# পুকুর, খালবিল ইত্যাদির পানি যাতে দূষিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

# যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ বা ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না।

# স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।

# পানিতে কোনো ময়লা ফেলা যাবে না।

# জাহাজ থেকে নিঃসৃত তেল যেন নদীতে না ফেলা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

## মাটি দূষণ

মাটি দূষণের কারণ

মাটি দূষণ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। প্রধানত রাসায়নিক যৌগ ও কীটনাশক মাটি দূষণের জন্য দায়ী। এরূপ পদার্থ মাটির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেয়। মাটির বৈশিষ্ট্য হলো এতে পচনশীল পদার্থসমূহকে মিশে যেতে সাহায্য করে। এজন্য বিশুদ্ধ মাটিতে জৈব পদার্থের গড় পরিমাণ থাকা চাই ৩% ভাগ। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, অনুজীব ইত্যাদি মাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু এ প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটে নিম্নোক্ত উপায়ে-

১. জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশাকের ব্যবহার মাটিকে দূষিত করে। বাংলাদেশে কৃষিকাজে প্রতি বছর ১৬.২০ হাজার টন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়, যা মাটি দূষণের জন্য দায়ী।

২. ভূতলে সংরক্ষিত জ্বালানি তেলের ট্যাংক থেকে মাটি দূষিত হয়।

৩. বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, নৌযান, ইঞ্জিন ইত্যাদি থেকে নিঃসৃত তেল মাটিতে পড়ে মাটিকে দূষিত করে।

৪. শিল্পবর্জ্য, ট্যানারি বর্জ্য, টেক্সটাইল কারখানার রং মিশ্রিত পানি ইত্যাদি পানির মাধ্যমে মাটিতে এসে পড়ে। এসব বর্জ্য পদার্থ মাটিকে দূষিত করে।

৫. পলিথিন, প্লাস্টিকজাত পণ্য, রবার, মেডিক্যাল বর্জ্য ইত্যাদি মাটিতে নিক্ষেপ করা হলে তা মাটির সাথে মিশে যায় না। প্রকৃতিতে পলিথিন ৪০০ বছর পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এটি মাটি দূষণের মাত্রাকে ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## মাটি দূষণ

মাটি দূষণের প্রভাব

মাটি দূষণের জন্য প্রধানত' কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, যা মরুকরণ প্রক্রিয়াকে তীব্র করে তোলে। বাংলাদেশে মাটি দূষণের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী নৈতিবাচক।

মাটি দূষণের ফলে মাটির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায়। উপকারী ব্যাকটেরিয়া কমে যায়। ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এজন্য কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করার দরকার হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। চূড়ান্ত ফল হিসেবে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। যা খাদ্য ঘাটতি, পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। গরিব মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধিতে মাটি দূষণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাটি দূষণের ফলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা কমে যায়। 'শহরাঞ্চলের মাটির উপরিভাগের এক বড় অংশ রাস্তাঘাট, ভবন ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা থাকায় বর্ষাকালে পানি মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে একদিকে যেমন বন্যার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি ভূগর্ভস্থ পানিশূন্যতা পূরণ হয় না। ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যায়। এরূপ অবস্থা মরুকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য দায়ী। মাটি দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকিস্বরূপ। বিভিন্ন রোগব্যাধির বিস্তারে মাটি দূষণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## মাটি দূষণ

মাটি দূষণরোধে করণীয়

মাটি দূষণের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর প্রধান কারণ হলো সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব। কলকারখানার বর্জ্য, মেডিক্যাল বর্জ্য, ই-বর্জ্য, ব্যবহৃত তেল, প্লাস্টিক ও পলিথিন সামগ্রী, গৃহস্থালিও পয়ঃবর্জ্য মাটি দূষণ বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি ও ব্যবস্থাপনা। কলকারখানা থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য যাতে কোনোভাবেই পানি বা মাটিতে না ফেলা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে। অব্যবহৃত পলিথিন যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ধ্বংস করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তেল পেট্রোলিয়ামজাতীয় পদার্থ কোনোভাবেই মাটিতে নিক্ষেপ করা যাবে না।

মাটি দূষণের অপর কারণ হলো মাটিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ধৈঞ্চা, শিম জাতীয় গাছ লাগাতে হবে। পরিত্যক্ত খোলা মাটি দূষণরোধে ঘাস লাগানো যায়। সর্বোপরি মাটি দূষণরোধে ব্যাপক জনসচেতনতা ও প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

আবহাওয়া ও জলবায়ু শব্দ দুটি প্রায় সময় সমার্থক বলে বিবেচনা করা হলেও এ দুটি বিষয় আলাদা। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের বায়ুমন্ডলীয় অবস্থা। আর জলবায়ু হচ্ছে কোনো একটি বৃহৎ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। কোনো স্থানের গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বা Climate Change বলা হয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিবর্তন, বরফ গলে যাওয়া, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনকে বোঝায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো উন্নত বিশ্বের বল্গাহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ ও ভোগবিলাসিতার দরুন সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের খেসারত সবচেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে।

বাংলাদেশে বসবাস করে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৫% শতাংশ। বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু ১২৩.৩ কেজি কার্বন নিঃসরণ করে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনের অবদান রাখে মাত্র ০.১% ভাগ। অথচ এ দেশটিই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ (MVC) গুলোর মধ্যে প্রধান একটি।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৯৬১-১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিবছর তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৬১-২০০০ পর্যন্ত তাপমাত্রা বেড়েছে প্রতিবছর গড়ে ০.৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ শেষ ১০ বছরে তাপমাত্রা বাড়ার হার এত পরিমাণ বেশি যে গত ৪০ বছরের গড় তাপমাত্রার প্রায় দুই গুণ। এদিকে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আহসান উদ্দিন আহম্মেদ তাঁর 'জলবায়ু পরিবর্তন গভীর সঙ্কটের আবর্তে বাংলাদেশ' বই-এ লিখেছেন ২০২০ সালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়বে ০.৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ২০৫০ সালে বাড়বে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১ ডিগ্রি, ২০৫০ সালে সেটা বেড়ে যাবে ১.৪ আর ২১০০ সালে গিয়ে এদেশে ঐ তাপমাত্রাই বাড়বে কম করে হলেও ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুধু কি তাই, শীতকালে শীত কমে বাড়বে গরম আর গ্রীষ্ম মৌসুম লম্বা হয়ে উষ্ণতা হবে হালকা। তখন ছয় ঋতুর বাংলাদেশে চার ঋতু খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের ওপর একটি বড় প্রভাব। IPCC তার চতুর্থ প্রতিবেদনে বলেছিল, ২১০০ সালে আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৮৬ সেন্টিমিটার বাড়বে। কিন্তু এখন বলছে, ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটারের অধিক ছাড়িয়ে যাবে। এতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৩ ভাগ মানুষের আবাস সমুদ্রে পানিতে তলিয়ে যাবে। তার মানে, বাংলাদেশের প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা সমুদ্রের পানিতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি আমাদের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর দিক হতে পারে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ব্রিটেনের 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট' পত্রিকায় বিশ্ববিখ্যাত সাংবাদিক জোহান হ্যারির এক মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনে। ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বাংলাদেশ ঘুরে গিয়ে এক মন্তব্যে বলেছিলেন, দেশটির মৃত্যুফলকে লেখা থাকবে, বাংলাদেশ, ১৯৭১-২০৭১: বর্ন ইন ব্লাড ডাউড ইন ওয়াটার' অর্থাৎ রক্ত ঝরিয়ে জন্ম, পানিতে ডুবে মৃত্যু। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের মাত্র ১ মিটার উচ্চতাকে মোকাবিলা করার জন্য খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। উচ্চতা যদি ১ মিটার বৃদ্ধি পায়, তার প্রভাবে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) কমে যেতে পারে ২৫-৫৭ ভাগ।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

ইউএডিপির প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো

'উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, এশিয়ার সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৮০-২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ঘূর্ণিঝড়ে মারা গেছে আড়াই লাখ মানুষ, যার ৬০ শতাংশই বাংলাদেশের। ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের চেয়ে ফিলিপাইন তিন গুণ বেশি ঝুঁকিতে থাকলেও আমাদের দেশে মৃতের সংখ্যা ফিলিপাইন থেকে দশগুণ বেশি।

১৯৯১ সালের ২০ এপ্রিলের পর থেকে ২০০৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে চারবার ঘূর্ণিঝড় হলেও তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডরের আঘাতে দেশ যে এভাবে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে সেটা কেউ ভাবতে পারেনি।

সিডর আঘাত হানার ছয় মাস পর আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস। ২০১০ সালের ২৬ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় রেশমি, ১৫ নভেম্বর খাইমুক, ২৬ নভেম্বর নিসা, পরের বছরের ১৭ এপ্রিল বিজলি ও ২৫ মে আঘাত করে ঘূর্ণিঝড় আইলা। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন'-এর এক সমীক্ষার বরাত দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে বন্যার ঝুঁকিতে প্রথম, সুনামির ঝুঁকিতে তৃতীয় ও ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিতে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

কৃষি উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্রতিবছর খরার কারণে শতকরা ৯০ ভাগ আমন ফসলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের প্রায় ৯.৩২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আমন ছাড়াও বোরো, গম, ভুট্টা, আলু, আখ, নানা শাকসবজি ও তেলবীজ উৎপাদন খরার কবলে পড়ছে। দেখা গেছে, বর্তমান হারে কৃষি উৎপাদন কমতে থাকলে একুশ শতকে তা আমাদের দেশে ৩০ শতাংশ কমে যাবে। ২০৫০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশের ধান ও গমের উৎপাদনে বড় বিপর্যয় দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দেশে যে ভয়াবহ দুর্ভোগের সূচনা করে তা হচ্ছে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিপর্যয়, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের চরম অবনতি, সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, শ্বাসকষ্ট, সর্দি-কাশি, যক্ষ্মা, চর্মরোগ, মানসিক ভারসাম্যহীনতার ব্যাপক ব্যাপ্তি। এছাড়া হচ্ছে জলবাহিত রোগ যেমন- কলেরা, যকৃতের ব্যাধি, ডায়রিয়ার প্রসার। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এদেশের মোট রোগের ৬৪ শতাংশ সংঘটিত হয় জলদূষণের কারণে এবং এর জন্য চিকিৎসা বাবদ ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের বিপুল অর্থও ব্যয়িত হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক জুন ২০০৯ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে ডায়রিয়া, চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া ও মানসিক রোগ অন্যতম। এ রিপোর্টে দেখা যায়, বিগত ১০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে নতুন মানসিক রোগীর সংখ্যা ২২,৪৩১ জনে বৃদ্ধি পায়, যা ডেঙ্গুর চেয়ে বেশি (৩৩০৫)।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে দরিদ্র ও জলবায়ু শরণার্থী উভয়ই আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের জলবায়ুবিষয়ক সবচেয়ে প্রভাবশালী গবেষক স্যার নিকোলাস স্টার্নের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আর্থসামাজিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষতি অন্যদের চেয়ে বহুগুণে বড়ে যাবে। এ কারণে ভৌগোলিকভাবে নাজুক ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র বাংলাদেশের অবস্থা হবে সবচেয়ে খারাপ। ৪ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত 'জলবায়ু পরিবর্তন: দরিদ্র ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে ড. আতিক রহমান বলেন, বিগত দুই তিন বছরে দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে। ২০০৬ সালে দেশে দরিদ্র লোকের পরিমাণ ছিল ৩৮ শতাংশ, যা ২০০৮ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ শতাংশে। ২০০৭ সালের বন্যা ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় এ দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে বিশ্বে ২০৫০ সাল নাগাদ ৪৫ জনের মধ্যে ১ জন জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হবে, সেখানে বাংলাদেশের প্রতি ৭ জনে ১ জন শরণার্থী হবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের ৩ কোটি মানুষ স্থায়ী উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে পারে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশকে রক্ষা করতে আমাদের অনেক করণীয় দিক রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততা কমানোর ক্ষেত্রে উপকূলে পরিকল্পিতভাবে পলি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে টিআরএম পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে। কৃষি বিপর্যয় রোধের ভাসমান পদ্ধতিতে চাষসহ চাষাবাদের নতুন পদ্ধতি ও ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল ঠিক করতে হবে। কৃষি বিপর্যয় রোধে 'ভাসমান পদ্ধতিতে চাষসহ চাষাবাদের নতুন পদ্ধতি ও ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল ঠিক করতে হবে। প্রতিনিয়ত নদীগর্ভ খনন করে এর নাব্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নগরের পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। অবৈধভাবে বৃক্ষ কর্তন ও ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া বন্ধ করতে হবে।

# বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত সমস্যার ধারণা, কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ-প্রতিকার



## জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সৃষ্ট সমস্যা

২০০৯ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলনে উন্নত দেশগুলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বৈশ্বিক উষ্ণতা দু ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হবে, দরিদ্রতর দেশগুলোর জন্য ২০১০-২০১২ সালের জন্য জলবায়ু তহবিলে ২৫-৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে। আশা করা হচ্ছিল বাংলাদেশ আনুপাতিকহারে তহবিলের ১৫ শতাংশ হিস্যা পাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অভিযোজন ও কার্বন নিঃসরণের জন্য তহবিল গঠনের দাবির পাশাপাশি উন্নত দেশগুলো যাতে কার্বন নির্গমন সীমিত রাখে সে বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে। কার্বন বাণিজ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তর উপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলোর (বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক) জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও ভূমিকার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

# THANK YOU

# HSC
# একাডেমিক কোর্স

## সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৯– বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

# সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

[চা. বো. '২২: য. বো. '২২, কু. বো. '২২]

ক. ইভটিজিং কী?

খ. জঙ্গিবাদের সাথে দারিদ্র্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের? চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

# সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান



স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে ভালোই চলছিল পোশাককর্মী রাবেয়ার সংসার। কিন্তু করোনাকালীন লকডাউনে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কর্মচ্যুত হলে গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী রফিক রাবেয়া ও তার মতো বেশ কিছু পরিবারের আয় উপার্জনে সহায়তার জন্য কাজ করছে।

[ঢা. বো. '২১; য. বো. '২১: কু. বো. '২১; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

খ. অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের সামাজিক সমস্যাটি চিহ্নিত কর।

ঘ. রফিকের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক- বিশ্লেষণ কর।

# সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান



মেধাবী প্রভা ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা বন্ধুর ছেলের সাথে তার বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের দিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ বিয়ে ভেঙে দেন। গ্রামবাসী চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন; তারা তাদের কন্যাদের উচ্চশিক্ষিত করে বিয়ে দিবেন। বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়।

[ঢা. বো. '২১; য. বো. '২১; ফু. বো. '২১; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

ক.জেন্ডার বৈষম্য কী?

খ. কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কর্মদক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে প্রভার ক্ষেত্রে কোন সামাজিক সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যান সাহেবের ভূমিকা কীভাবে সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে? বিশ্লেষণ কর।

# THANK YOU